দ্য সেভেন্থ্ প্লেগ

দ্য সেভেন্থ প্লেগ

জেমস রলিন্স

রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
মোঃ আফরানুল ইসলাম

ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, ঢাকা-১১০০
ফোন ০১৬২৬২৮২৮২৭
প্রকাশকাল ডিসেম্বর, ২০১৭
© আদী প্রকাশন
প্রচ্ছদ আদনান আহমেদ
অলংকরণ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক www.rokomari.com/adee
মূল্য ৪৪০ টাকা

The Seventh Plague by James Rollins
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 440 Tk. U.S. :20 $ only
ISBN

উৎসর্গ

আবার বাবা ও মা রোনাল্ড আর মেরি অ্যানকে
তাদের অনুপ্রেরণার জন্য, সমর্থনের জন্য এবং কীভাবে ভালোবাসতে হয়-তা
শেখাবার জন্য . . .
. . .মৃত্যুর ওপারেও একসাথেই আছেন তারা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটির উৎকর্ষতার পেছনে রয়েছে অনেকের অবদান। তাদের সাহায্য, পথ-নির্দেশনা, সমালোচনা, উৎসাহ এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাদের বন্ধুত্ব ছাড়া যা কখনওই সম্ভব হতো না। আমার সমালোচক দলটাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, হাতে গোণা কয়েকজন পাঠককে নিয়ে গড়া এই দলটা আমার প্রাথমিক সম্পাদক। আমাকে আরও ভালো করার জন্য যারা বকাঝকা করতে দ্বিধা করেন না- স্যালি অ্যান বার্নস, ক্রিস ক্রো, লী গ্যারেট, জেন ও'রিভা, ড্যানি গ্রেসন, লিওনার্ড লিটল, জুডি প্রে, ক্যারোলিন উইলিয়ামস, ক্রিশ্চিয়ান রাইলি, টোড টড, ক্রিস স্মিথ এবং অ্যামি রজার্স। সেই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ স্টিভ পেরিকে, এমন অসাধারণ সব মানচিত্র এঁকে দেবার জন্য। ডেভিড সিলভিয়ানকে ধন্যবাদ, ওকে ছাড়া আমি এগোতে পারতাম না। এই পাতাগুলোর মাঝে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক যেসব লেখা দেখতে পাবেন, তার অনেকগুলোর জন্য ধন্যবাদ পাবে চেরি ম্যাককার্টার! হার্পারকলিনসের সবাইকে ধন্যবাদ, আমাকে দেখে শুনে রাখার জন্য। তাদের মাঝেও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে মাইকেল মরিসন, লিঅ্যাট স্টেহলিক, ড্যানিয়েল বার্লেট, কেইটলিন হারি, জশ মারওয়েল, লিন গ্রেডি, জিঅ্যান রেইনা, রিচার্ড অ্যাকুয়ান, টম এগনার, শন নিকোলস এবং অ্যানা আমিরা অ্যালিসি-এর নাম। সব শেষে আলাদা করে ধন্যবাদ জানাই বইটির আলোর মুখ দেখার পেছনে যাদের সরাসরি অবদান আছেঃ আমার সম্পাদক, লাইসা কেইউসখ ও তার বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা কৃষ্ণা; আমার এজেন্ট, রাস গ্যালেন এবং ড্যানি ব্যারোর (সেই সাথে ওর মেয়ে হেদার ব্যারোর)।

সব শেষে বলতে চাই, এক বইতে যে সব তথ্য বা বর্ণনা সংক্রান্ত ভুল আছে, তার সব দায়ভার আমার . . .একান্তই আমার।

মানচিত্রঃ

নীল নদের বেসিন

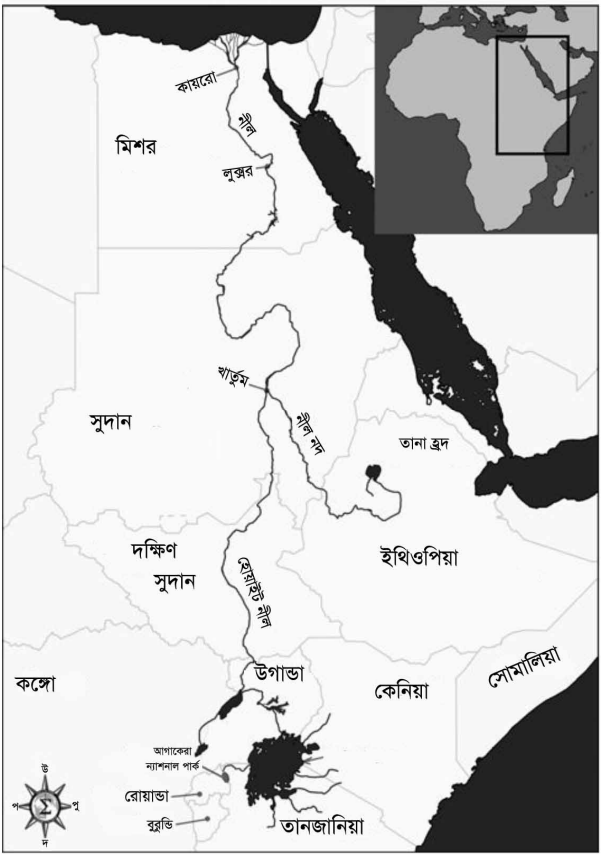

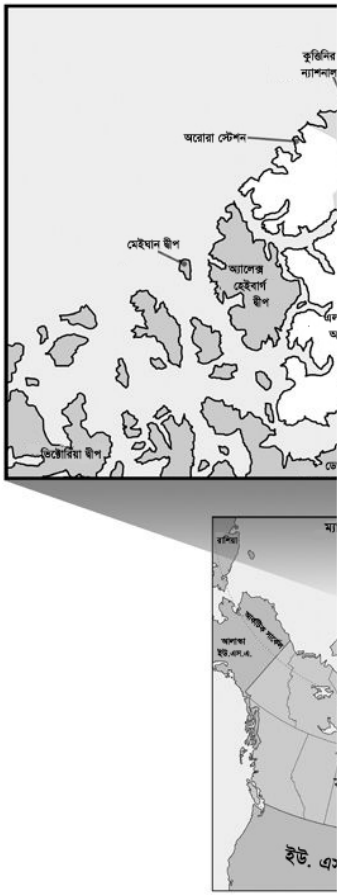

অরোরা স্টেশন
মেইঘান দ্বীপ
অ্যালেক্স হেইবার্গ দ্বীপ
ভিক্টোরিয়া দ্বীপ
রাশিয়া
আলাস্কা ইউ.এস.এ.

অতঃপর মোজেস তার অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই দিনটার কথা স্মরণ রেখো, যে দিন তোমরা মিশর থেকে, দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছ। এই সেই দিন, যেদিন প্রভু তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন তার ক্ষমতা . . .'

এক্সুডাস ১৩ঃ৩

বাইবেলে অনেক কম গল্পই আছে যেগুলো মোজেসের গল্পের চাইতে বেশি ভীতিপ্রদ। চাই কাগজে লিখে হোক বা পর্দায় দেখিয়ে, এই গল্প বারবার আমরা শুনতে বা দেখতে পাই। জন্মের পরপর নল-খাগড়ার বাক্সে করে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে, বিধির খেলায় স্থান পেয়েছিলেন ফারাওয়ের কন্যার কোলে। আবার বয়সকালে সেই ফারাওয়ের পুত্রের-ই মুখোমুখি হতে হয়েছিলেন। মোজেস তাই কিংবদন্তীর এক চরিত্র। ইহুদী সম্প্রদায়কে দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি মিশরে নামিয়ে এনেছিলেন দশটা অভিশাপ। এরপর সমুদ্রকে দুইভাগ করে চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে ফিরেছেন মরুভূমিতে। টেন কমান্ডমেন্টস বা দশ ঐশী আদেশ এনে দাঁড়া করিয়েছিলেন আইনের নতুন এক পদ্ধতি।

কিন্তু আসলেই কি ঘটেছিল এসব? অনেক ইতিহাসবিদ, এমনকি অনেক ধর্মীয় নেতাও মিশর-ত্যাগের গল্পকে সত্য বলে মেনে নেননি। তাদের কাছে গল্পটা আসলে রূপক, ঐতিহাসিক সত্য নয়। সন্দিহান প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলেন, গল্পটা সত্যি হলে মিশরীয় উৎস থেকে ওই মহামারী বা মিশর-ত্যাগের সমর্থনে কোন উপাত্ত পাওয়া যায় না কেন?

তবে নীল নদের অববাহিকায় আবিষ্কৃত কিছু আধুনিক আবিষ্কার কিন্তু অন্য কথা বলে। আসলেই কি মোজেসের গল্পের সত্যতা আছে? মিশর-ত্যাগের ঘটনা কি সত্যি সত্যি ঘটেছিল? অলৌকিক ঘটনা আর অভিশাপগুলো? আশা করি এই বইয়ের পাতাগুলোর মাঝে সেই সত্যটা আপনারা আবিষ্কার করতে পারবেন। এখানকার প্রতিটা তথ্যই গ্রহণযোগ্য উৎস থেকে নেয়া। যেমন ইসরায়েল শব্দটা পাওয়া যায় রামেসিস দ্য গ্রেটের সন্তানের স্মৃতিস্তম্ভে!

প্রশ্ন হলো, যদি মিশরে সত্যি সত্যি ওই অভিশাপ . . .ওই মহামারীগুলো ঘটে থাকে, তাহলে কি সেটা আবার ঘটতে পারে?

এবার পুরো বিশ্বজুড়ে?

উত্তরটা ভয় জাগানিয়া হলেও সত্য . . .হ্যাঁ।

বৈজ্ঞানিক নথি থেকে

আমরা যা আশা করি, তা হলো জলবায়ু। যা পাই, তা আবহাওয়া।
–মার্ক টোয়েন (অসমর্থিত সূত্রমতে)

আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হচ্ছে পরিস্থিতি-শুধু বৈশ্বিক উষ্ণতাই বাড়ছে না, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এ ব্যাপারে হওয়া নানা আলোচনার উত্তপ্ততাও! জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত বিগত বছরগুলোর তথ্য কি সত্যি?এই প্রশ্নের জায়গা এখন করে নিয়েছে অন্য আরেক প্রশ্ন-কেন জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং কীভাবে এটাকে থামানো যায়?

এমনকি কয়েক বছর আগেও যারা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতেন, তারাও আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছেন। মানবেন না-ই বা কেন? দুনিয়া জুড়ে গলতে শুরু করেছে হিমবাহ, গ্রিনল্যান্ডের বরফ চোখের পলকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, এমনকি তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে সমুদ্রের জলধারার! গত কয়েক বছরের আবহাওয়ার পরিবর্তনও কি লক্ষণীয় নয়? কোথাও খরা হচ্ছে তো হচ্ছেই, আবার কোথাও বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সবকিছু। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারির একটা রিপোর্ট অনুসারে, আলাস্কা সেবার দেখেছে তার ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উষ্ণ শীতকাল। স্বাভাবিকের চাইতে দশ ডিগ্রী ফারেনহাইট বেশি ছিল সেই মে মাসের তাপমাত্রা। আর্কটিকের আইস-ক্যাপ নিয়ে সংগঠিত এক হিসাব থেকে আমরা এখন জানি, সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছিল তার পরিমাণ।

তবে এসবের চাইতে ভয়ানক যে প্রশ্নটা নিয়ে এই বইতে আমি লিখেছি তা হলো, এরপর কী হতে যাচ্ছে? উত্তরটা অবাক করে দেবে যে কাউকে। অথচ শক্ত প্রমাণ এবং বিজ্ঞান তার পেছনে থাকলেও, এই উত্তরটা নিয়ে পারতপক্ষে কেউ কথাই বলতে চায় না! পাঠক, শুনলে আপনারাও চমকে যাবেন, কেননা এসব আগেও ঘটেছে! বিশ্বাসী হন বা অবিশ্বাসী, আগে থেকে জেনে রাখার সুবিধা হলো, আগে-ভাগে প্রস্তুত হয়ে থাকা যায়।

আসুন, আমাদের এই গ্রহের ভবিষ্যতটা জেনে নেই।

এপিগ্রাফ

প্রভু ঈশ্বর মোজেসকে বললেন, ‘অ্যারনকে বলো, ‘হাতে তুলে নাও তোমার লাঠি, হাত বাড়িয়ে দাও মিশরের সমস্ত পানি, সমস্ত জলাধার–নদী আর পুকুরের প্রতি; যেন মিশরের সমস্ত জল পরিণত হয় রক্তে, চাই তা কাঠের পাত্রে রাখা হোক . . .বা হোক পাথরের পাত্রে।’ ’

এক্সুডাস ৭ঃ১৯

মিশরের জন্য দানিয়েল কেবলই একটা নদী নয়।

–মার্ক টোয়েন

প্রারম্ভ

বসন্ত, ১৩২৪ বি.সি.

নুবিয়ার মরুভূমি, দক্ষিণ মিশর

প্রধান যাজিকা নগ্ন হয়ে বালুর উপর শুয়ে আছেন; তিনি জানেন-সময় সমাগত। লক্ষণগুলো একে একে ফুটে উঠতে শুরু করেছে, আস্তে আস্তে সম্ভাবনা পরিণত হয়েছে নিশ্চয়তায়। পশ্চিমে এক বালুঝড় যেন সূর্যকে স্পর্শ করার আগ্রহে লাফিয়ে উঠছে, মধ্য দুপুরেও অন্ধকার হয়ে এসেছে সবকিছু। থেকে থেকে হচ্ছে বজ্রপাত।

শত্রুপক্ষ এসে পড়েছে প্রায়।

প্রস্তুতি হিসেবে সাবাহ তার দেহের সব লোম চেঁছে ফেলেছেন, এমনকি রঙ করা চোখের পাতার উপরের ভ্রূটুকুও আর নেই। মরুভূমির গভীর থেকে বেরিয়ে আসা নদীর উভয় শাখার পানিতেই গোসল সেরেছেন তিনি। শাখা দুটো এসে জড়ো হয়েছে যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এখন। এই মোহনাকে হেকা খাসেশেট-এর প্রাচীন সম্রাটরা ডাকতেন নাহাল বলে। কল্পনার চোখে নদীটার অগ্রগতি দেখতে পেলেন সাবাহ, দেখলেন কীভাবে সাপের মতো এঁকেবেকে ওটা লুক্সর, থিবস, মেমফিস হয়ে সমুদ্রের সাথে মিলতে ছুটছে।

ওসব এলাকা কখনও চোখে দেখেননি তিনি, তবে গল্প শুনেছেন প্রচুর।

আমাদের আদি বাসস্থানের গল্প, যেখানে সব সবুজের সমারোহ। নাহালের প্লাবন হয় যেখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর। সুখে-শান্তিতে যেথায় বাস করে মানুষ।

ওখান থেকেই পালিয়ে এসেছে সাবাহের গোত্র, তা-ও প্রায় একশো বছরের বেশি হলো। মহামারী, ক্ষুধা, মৃত্যু আর অত্যাচারী এক ফারাওয়ের হাত থেকে পালাতে হয়েছে তাদের। ওই ব-দ্বীপের অন্যান্য গোত্র আশ্রয় নিয়েছে পূব দিকের মরুভূমিতে। যতদূর সাবাহ জানেন, ওখানকার কিছু এলাকা দখল করে নিজেদের সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু ওর নিজের গোত্র এসেছে এদিকে, নদী ধরে আরও দক্ষিণে। জেবা নামক গ্রামের কাছে বাস করে তারা। হোরাসের সিংহাসন বা ওয়েটজেস-হোর নামক জেলায় ওটার অবস্থান, মিশরের উচ্চভূমিতে।

সেই অন্ধকার আর মৃত্যুর সময়ে তার গোত্র চিরতরে ছেড়ে এসেছে তাদের আদি নিবাস। মিশরীয় সাম্রাজ্যের হাত এড়াতে একেবারে নুবিয়ান মরুভূমির ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে। এই গোত্রটা শিক্ষিতদের গোত্র। অগণিত জ্ঞানী, লিপিকার, যাজক-যাজিকা আর জ্ঞানের ধারক আছেন ওদের মাঝে। মহামারীর পর যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ইতিহাস সাথে করে নিয়ে পালিয়েছেন তারা। সেই

সময় বর্বর এক জাতি দখল করে নিয়েছিল মিশর, ব্রোঞ্জের রথ আর উন্নতমানের অস্ত্র হাতে থাকায় তাদের সে কাজে খুব একটা কষ্ট হয়নি।

তবে সেই অশুভ সময়ের পরিসমাপ্তি হতে আর বেশি দেরী নেই।

আবার মাথা তুলতে শুরু করেছে মিশর। হানাদার বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে গড়তে শুরু করেছে তাদের বিজয়ের নানা নিশান। এমনকি এদিকেও রওনা হয়েছে তারা!

'হেমেত নেজার . . .' সাবাহের নুবিয়ান সহকারী, টাবর নামের এক যুবক বলল। ছেলেটা সম্ভবত ওর মাঝে চলতে থাকা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আভাস পেয়েছে। তাই হয়তো হেমেত নেজার . . .ঈশ্বরের সাহায্যকারিণী হিসেবে ওর দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে চাইল সে। 'আমাদের এখুনি যেতে হবে।'

উঠে দাঁড়ালেন সাবাহ।

টাবরের চোখ পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসা ঝড়ের দিকে। তবে উত্তর দিকের আকাশের মেঘের ছোঁয়া নজর এড়াল না সাবাহের। নাহালের পঞ্চম জলপ্রপাতের পাশের কোন গ্রাম মিশরীয় সেনাবাহিনীর রোষের শিকার হয়েছে, বুঝতে পারলেন তিনি। এখানে এসে পৌঁছাতে তাদের আর বেশি সময় লাগবে না।

তার আগেই গুপ্ত সঙ্ঘের সবাইকে নিয়ে প্রায় এক শতাব্দী ধরে রক্ষা করে আসা গোপন জ্ঞানটা লুকিয়ে ফেলতে হবে ওকে। ঈশ্বরের অন্য যেকোন আশির্বাদের মতো যেটা লুকিয়ে আছে এক অভিশাপের ভেতর।

এক হাজার দিন ধরে চলছে তার প্রস্তুতি। শুরু হয়েছে মিশরীয়দেরকে গ্রামের পর গ্রাম জয় করে এগোতে দেখে। পবিত্রকরণের নানা পদ্ধতির দিকেই বেশিরভাগ মনোযোগ ছিল সবার। ঈশ্বরের আশির্বাদ ধারণের পাত্র হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হলে যার কোন বিকল্প নেই।

একদম শেষে এই পরিবর্তনের জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে সাবাহকে। কেননা তাকেই সঙ্ঘের অন্য ভাই-বোনদের প্রস্তুত করতে হয়েছে। গত এক বছরের মাঝে কোন দানাদার শস্য মুখে পর্যন্ত তোলেননি মহিলা; খেয়েছেন শুধু বাদাম, জাম, গাছের বাকল আর রেসিন মিশ্রিত চা। সময়ের সাথে সাথে তার দেহের সব মাংস শুকিয়ে লেগে গিয়েছে হাড়ের সাথে, নারীত্বের প্রতীক-রূপী স্তন আর নিতম্ব শুকিয়েছে সবার আগে। বয়স মাত্র ত্রিশের কোঠায় হলেও, টাবরের সাহায্য ছাড়া এখন আর এক পা-ও এগোনো সম্ভব না তার পক্ষে।

লিলেনের রোবটা গায়ে চড়িয়ে মোহনার কাছ থেকে সরে আসতে শুরু করলেন তিনি। ঝড়টা চোখের সামনেই তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে। সাবাহ যেন টের পাচ্ছিলেন সেই ঝড়ের বিচ্ছুরিত শক্তি, আস্তে আস্তে সারা মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়ছে সেই তাপ। বাতাসে ভাসছে তার গন্ধ, হাতের রোমকূপগুলোতেও সেগুলোর অস্তিত্ব

অনুভব করছেন তিনি। ঈশ্বর চাইলে, এই বালুঝড় তাদের পায়ের ছাপ লুকিয়ে ফেলবে। সেই সাথে ঢেকে দেবে তাদের সেরা সৃষ্টিটাকেও . . .

. . .তবে এখন জরুরী হচ্ছে সেই পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছানো।

মন থেকে ওসব ভাবনা সরিয়ে দিয়ে এক পায়ের সামনে আরেক পা ফেলার প্রতি মনোযোগী হলেন সাবাহ।

কেন যেন তার মনে হচ্ছে, নদীর ধারে একটু বেশিই সময় কাটিয়ে ফেলেছেন। টাবরকে সাথে নিয়ে যখন তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানটায় পা রেখেছেন, তখন তাদেরকে ধরে ফেলেছে উন্মত্ত বালুঝড়!

'তাড়াতাড়ি করুন, মাননীয়া।' তাড়া দিল টাবর, হাত বাড়িয়ে তুলল সাবাহকে। বলতে গেলে এখন তাকে বয়েই নিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

আমি ব্যর্থ হবো না . . .

এক মুহূর্ত পরেই নিজেদেরকে তারা আবিষ্কার করলেন বেলেপাথর খোদাই করে বানানো সেই অত্যাশ্চর্যের পেটে। লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, চারিদিকে ছায়ার উন্মাদনা। যতই এগোচ্ছেন, ততই শিল্পীদের অসাধারণ যত্ন আর প্রতিভার ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ প্রায় সত্তর বছর আগে বানানো এই অত্যাশ্চর্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন।

লম্বা লম্বা দাঁতরূপী পাথর আর পাথুরে জিহ্বা পার হয়ে এগিয়ে যেতে তাকে সাহায্য করল টাবর। অসাধারণ দক্ষতায় প্রায় আসলের মতো করেই বানানো হয়েছে ওগুলো। সামনে দু'টি পথ উন্মুক্ত হয়ে আছে। একটা সরাসরি পাকস্থলীতে চলে গিয়েছে, অন্যটা উঠা-নামা করতে করতে হারিয়ে গিয়েছে বুকের ভেতরে।

পরের পথটা ধরে এগোতে লাগলেন তারা।

চলতে চলতে মানসচোখে যেন ভূ-গর্ভস্থ অত্যাশ্চর্যের পুরোটা একসাথে দেখতে পেলেন সাবাহ। অনেক আগেই খোদাই করা হয়েছে এই জায়গাটা, মহিলাদের দেহাভ্যন্তরের অনুকরণে। পাহাড়ের নিচে শুয়ে আছে সেই শিল্পকর্ম; বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। কেননা এই পাথুরে মহিলার ত্বক হচ্ছে মাটি। মানব দেহের অভ্যন্তরের সমস্ত আঁক-বাঁক নিপুণ দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে: যকৃত, বৃক্ক, মুত্র-থলী, মগজ-কিছুই বাদ যায়নি।

বলা যায়, পাহাড়ের নিচে নিজেদের জন্য পাথুরে দেবতাকে বানিয়ে নিয়েছে তার গোত্র। চাইলে এর ভেতরে বাসও করতে পারে তারা। আলাদা করে রাখতে পারে সেই বস্তুকে, যা সবার থেকে দূরে রাখতেই হবে!

আমাকে শক্ত হতে হবে . . . হতে হবে ঈশ্বরের আশির্বাদের ধারণ-পাত্র।

সমানের পথটা আবারও দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তার বুকে যেমন শ্বাসনালী দুইভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে যায়, ঠিক তেমনি। বাঁ দিকের পথ ধরে

এগোলেন তারা। এই পথটা একটু নিচু বলে মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। তবে বেশিক্ষণ এই কষ্ট করতে হবে না তাদের।

আচমকা শেষ হয়ে গেল পথ, নিজেদেরকে বিশাল এক গুহার অভ্যন্তরে আবিষ্কার করলেন সাবাহ। দুইপাশে পাথরের পাঁজরের উপর ভর করে মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক শিরদাঁড়া।

ঘরটার ঠিক মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটা পাথরের হৃদপিন্ড। আকারে ওটা সাবাহের চারগুণ! অন্য সবকিছুর মতো এই হৃদপিন্ডও নিখুঁতভাবে বানানো। এমনকী সবগুলো রক্তনালীও দেখা যাচ্ছে।

আগে থেকেই ওখানে উপস্থিত থাকা নুবিয়ান ভৃত্যদের দিকে তাকালেন তিনি, হাঁটু গেঁড়ে আছে প্রত্যেকেই। অপেক্ষা করছে তারই আবির্ভাবের।

পাথুরে পাঁজরের হাড়ের দিকে নজর গেল সাবাহের। ওগুলোর মাঝে মাঝে রয়েছে অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ, এখন দেখা যাচ্ছে না। সদ্য-নির্মিত পাথর দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে ওগুলোকে। ওর সঙ্ঘের ভাই ও বোনেরা ওই প্রকোষ্ঠগুলোতে যার যার শেষ বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করেছে। নিশ্চয়ই চেয়ারের উপর বসে আছে তারা, দেহগুলো শেষ পরিবর্তন সমাপ্ত করে পরিণত হয়েছে ঈশ্বরের আশির্বাদের ধারণ-পাত্রে।

আমিই শেষ . . .আমিই শেষ ঈশ্বরের আশির্বাদ-প্রাপ্ত।

নজর সরিয়ে হৃদপিন্ডের দিকে তাকালেন তিনি। ছোট একটা দরজা রাখা হয়েছে ওতে, ভেতরে প্রবেশের জন্য। সঙ্ঘের সর্বোচ্চ সম্মান এই ব্যবস্থা।

টাবরের হাত নিজের উপর থেকে সরিয়ে শেষ পদক্ষেপগুলো একাই ফেললেন সাবাহ। দোরগোড়ায় এসে মাথা নিচু করে পা রাখলেন ভেতরে। পাথুরে দেয়ালের ঠান্ডা স্পর্শ তাকে আমন্ত্রণ জানাল। সামনেই একটা রুপালী চেয়ার তার জন্য অপেক্ষা করছে। ওটায় বসার সাথে সাথে সেই একই ঠান্ডা স্পর্শ অনুভব করলেন তিনি। তার একপাশে ল্যাপিস লাজুলি নির্মিত একটা পাত্র, পানিতে টুইটুম্বুর হয়ে আছে। পাত্রটাকে তুলে নিয়ে কোলের উপর রাখলেন সাবাহ।

দরজায় দেখা গেল টাবরকে, কথা বলতে পারছে না কষ্টে। কিন্তু চেহারা দেখে মনের অনুভূতি ঠিক বুঝতে পারলেন তিনি। দুঃখ, আশা আর ভয়ে পরিপূর্ণ ছেলেটার মন। তার নিজের ভেতরেও সেই অনুভূতি হচ্ছে। সেই সাথে রয়েছে কিছুটা সন্দেহও। কিন্তু সেসব পাত্তা না দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'শুরু করো।'

দুঃখ এবার পুরোপুরি দখল করে নিল ছেলেটার চেহারাকে। কিন্তু নড করে উধাও হয়ে গেল সে। সেই জায়গা দখল করে নিল আরেকজন ভৃত্য। মাটি ও খড় নির্মিত ইট দিয়ে সে ঢেকে দিতে লাগল দরজাটাকে। অন্ধকারের চাদর যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে সাবাহকে। তবে পুরোপুরি করার আগেই পাত্রটা তুলে নিলেন

তিনি। আধো আলো. . . আধো অন্ধকারে পানির হালকা উজ্জ্বল ভাবটা তার নজর এড়াল না, প্রায় রক্ত লাল দেখাচ্ছে এখন পানিটুকু। হাতে কী ধরে আছেন, তা ভালোভাবেই জানেন সাবাহ-নাহাল থেকে আনা পানি। নীল নদের পানি যেখানে রক্তে পরিণত হয়েছিল, সেখানকার। অনেক আগে সংগ্রহ করা হয়েছিল এই পানিটুকু, তারপর থেকে তার সঙ্গেই সেটা সংরক্ষণ করে আসছে।

শেষ ইটটা গাঁথা হতেই, এক চুমুকে পানিটুকু পান করে নিলেন সাবাহ। বাইরে থেকে কাদা লেপার আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই সাথে আসছে কাঠ জড়ো করার আওয়াজও।

চোখ বন্ধ করে ফেললেন সাবাহ, এরপর কী হবে তা জানেন।

কল্পনার চোখ দেখতে পেলেন, আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে কাঠে।

আস্তে আস্তে গরম হয়ে ওঠা মেঝে সেই কল্পনার সত্যতা প্রমাণে ব্যস্ত। বাতাস গরম হয়ে উঠল প্রায় সাথে সাথেই, আর্দ্রতাটুকু উধাও হয়ে গেল। সাবাহের মনে হলো-তিনি বুঝি বাতাস নয়, উত্তপ্ত বালুতে শ্বাস নিচ্ছেন!

কিন্তু চুপ করে রইলেন তিনি। বাইরে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের এতক্ষণে চলে যাবার কথা। এই অত্যাশ্চর্যে প্রবেশ করার সব পথ বন্ধ করে দেবে তারা। চলে যাবে এই এলাকা ছেড়ে। ঝড়ের আড়ালে উধাও হয়ে যাবে যেন।

চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল তার, তবে নিচে পড়ার আগেই বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। ফাটা ঠোঁট দিয়ে এখন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ব্যথার চিৎকার। আচমকা অন্ধকার চিরে হালকা একটা আভা দেখা গেল, তার কোলে রাখা পাত্রটা থেকে আসছে সেই আভা।

ব্যথার তীব্রতায় ভ্রম হচ্ছে কিনা, জানেন না সাবাহ। তবে সেই আভাটুকু যেন তাকে স্বস্তি পৌঁছে দিচ্ছে...যেন শক্তি যোগাচ্ছে শেষ কাজটা করার। অল্প যেটুকু পানি অবশিষ্ট ছিল, সেটাও পান করে ফেললেন তিনি। প্রাণদায়িনী পানিটুকু তার ঠোঁট থেকে গলা...গলা থেকে পৌঁছে গেল পাকস্থলীতে।

পাত্রটা যখন হাত থেকে নামিয়ে রেখেছেন, তখন ভেতরে উত্তাপ তীব্রতর থেকে তীব্রতম হচ্ছে। অথচ ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে হাসলেন তিনি। জানেন, নিজের ভেতরে কাকে স্থান দিয়েছেন।

আমি আপনার আশির্বাদের ধারণ-পাত্র হে প্রভু . . .চিরতরের জন্য।

রাত ৯: ৩৪ ই.এস.টি.
মার্চ ২, ১৮৯৫
নিউ ইয়র্ক সিটি

এতক্ষণে উট এল পাহাড়ের নিচে . . .

অনিচ্ছুক সঙ্গীকে সাথে নিয়ে স্যামুয়েল ক্লেমেন্স-যিনি কিনা তার ছদ্মনাম, মার্ক টোয়েন হিসেবে বেশি পরিচিত-গ্রামেসারি পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। একদম সামনে গ্যাসলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে দ্য প্লেয়ার্স ক্লাবের নামফলক। ওই ক্লাবের সদস্য তারা দু'জনেই।

হাসি-ঠাট্টা, আর আনন্দময় সময় কাটাবার হাতছানি দেখতে পেয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন টোয়েন। তার মুখের সিগারটা থেকে ঘন ধোঁয়া বেরিয়েই আবার হারিয়ে যাচ্ছে রাতের আঁধারে। 'নিকোলা, তোমার কী মনে হয়?' পেছন ফিরে বন্ধুকে বললেন তিনি। 'আমার পকেট ঘড়ি আর পাকস্থলী ঘোষণা দিচ্ছে যে ক্লাবে এরইমধ্যে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। আর তাছাড়া, সিগারের সাথে কিছুটা ব্র্যান্ডি হলে মন্দ হয় না।'

মার্ক টোয়েনের প্রায় বিশ বছরের ছোট, নিকোলা টেসলার পরনে একটা প্রাচীন স্যুট। ওটার দুই কনুইয়ের কাছের কিছুটা জায়গা আবার রঙচটা। বারবার মাথার কালো চুলে হাত বুলাচ্ছেন তিনি, আর চারপাশে নজর বুলাচ্ছেন। নার্ভাস হলে তার কথায় সার্বিয়ান টানটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'স্যামুয়েল, রাত অনেক হয়েছে। আমার অনেক কাজও বাকি। নাটক দেখিয়েছ, সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এখন ফেরা দরকার।'

'বাজে বোকো না তো! সবসময় এত কাজ করা মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর।'

'তাহলে তো তোমার মাথা খুব চালু হবার কথা . . .কাজ-টাজ তো কিছুই নেই!'

চোখে বিষ ঢেলে বন্ধুর দিকে তাকালেন টোয়েন। 'বলেই যখন ফেললে তো শোন-এই মুহূর্তে একটা বই নিয়ে ব্যস্ত আমি এখন।'

'কাহিনি আন্দাজ করি দাঁড়াও-হাক ফিন আর টম সয়্যার আবার ঝামেলায় জড়িয়েছে?'

'তা জড়ালে তো বেঁচেই যেতাম!' মুচকি হাসি দেখা গেল টোয়েনের চেহারায়। 'আমার পাওনাদারদের একটু ঠান্ডা করতে পারতাম।'

আগের বছরই নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন টোয়েন, অবশ্য কথাটা খুব একটা বেশি মানুষ জানে না। নিজের সব বইয়ের স্বত্ব তিনি তার স্ত্রী, অলিভিয়ার নামে দিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী বছরটা কাটাবেন দুনিয়া জুড়ে টাকার বিনিময়ে বক্তব্য দিয়ে।

টাকা-পয়সার প্রসঙ্গ ওঠায়, ফিকে হয়ে এল তার আনন্দ। অবশ্য নিজের জন্য না, নিকোলার জন্য। টোয়েন জানেন, তার বন্ধুরও টাকা-পয়সার টানাটানি চলছে। কোন সন্দেহ নেই, নিকোলা টেসলা অসম্ভব প্রতিভাবান একজন মানুষ। একই সাথে

আবিষ্কারক, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার এবং পদার্থ বিজ্ঞানী তিনি। কিন্তু টাকা-পয়সার মামলায় একেবারেই কাঁচা।

'আচ্ছা চলো, এক গ্লাস পান করলে খুব একটা ক্ষতি হবে না।' নিকোলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

হিসহিস করে জ্বলতে থাকা গ্যাসলাইটের নিচে এসে উপস্থিত হলেন তারা। কিন্তু ভেতরে ঢোকার আগেই ছায়ার মধ্যখান থেকে তাদের দিকে এগিয়ে এল এক অবয়ব।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বললেন লোকটা। 'তুমি এখানে আসবে বলে শুনেছিলাম।'

অবাক হয়ে গেলেন টোয়েন, তবে লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হলো না। 'আরে, স্ট্যানলি! এখানে কী করছ! আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি এখনও ইংল্যান্ডে আছ!'

'গতকাল ফিরে এসেছি।'

'দারুণ! চলো, তোমার প্রত্যাবর্তনের আনন্দে দুই গ্লাস হয়ে যাক। তিনটা হলে তো আরও ভালো!'

দুই বন্ধুকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলেন টোয়েন, কিন্তু স্ট্যানলি তাকে থামিয়ে দিলেন।

'আমার জানামতে,' বললেন তিনি। 'তুমি থমাস এডিসনকে চেন?'

'হুম . . .চিনি।' ইতস্তত করতে করতে জবাব দিলেন টোয়েন। নিকোলা আর থমাসের মাঝে যে গোলমাল আছে, তা তার অজানা নেই।

'রাজার আদেশে আমার লোকটার সাথে কিছু কথা বলা দরকার।'

'তাই?'

'আমি সাহায্য করতে পারি?' পাশ থেকে বলে উঠলেন টেসলা।

পরস্পরের সাথে অপরিচিত দুই ভদ্রলোককে পরিচয় করিয়ে দিলেন টোয়েন। 'নিকোলা, ইনি হচ্ছেন হেনরি মর্টন স্ট্যানলি। অতি সত্বর স্যার উপাধি পেতে যাচ্ছেন বলে শুনলাম। নিজে একজন অভিযাত্রী সে। সেই সাথে আফ্রিকার গহীনে হারিয়ে যাওয়া ডেভিড লিভিংস্টোন নামে পরিচিত আরেক অভিযাত্রীকে খুঁজে বের করার জন্য বিখ্যাত।'

'আহ।' বললেন নিকোলা। 'মনে পড়েছে। এই লিভিংস্টোন নিশ্চয় ড. লিভিংস্টোন?'

গুঙিয়ে উঠলেন স্ট্যানলি।

'আর ইনি হচ্ছেন নিকোলা টেসলা। এডিসনের বরাবর তো হবেই, সম্ভবত তার চাইতে বেশি প্রতিভাবান।'

পরিচয় পেয়ে ছোট ছোট হয়ে গেল স্ট্যানলির চোখ। 'আমার চিনতে পারা উচিৎ ছিল।'

লাল হয়ে গেল নিকোলার মলিন গাল।

'তো,' টোয়েন জানতে চাইলেন। 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবার তোমার ঘাড়ে কী চাপাল শুনি?'

কমতে শুরু করা ধূসর চুলে হাত বুলালেন স্ট্যানলি। 'তুমি তো জানোই, লিভিংস্টোন নীল নদের উৎস খুঁজতে গিয়ে আফ্রিকায় হারিয়ে গিয়েছিল। আমিও ওই উৎস খোঁজার জন্য কয়েকবার মাঠে নেমেছি।'

'তোমার মতো আরও অনেকেই নেমেছে।'

ভ্রু কুঁচকে ফেললেন স্ট্যানলি, তবে কিছু বললেন না।

'তারপর?' চাপ দিলেন টোয়েন।

বন্ধুকে কাছে টেনে পকেট থেকে একটা ছোট জিনিস বের করে আনলেন স্ট্যানলি। ছোট্ট একটা ভায়াল, ভেতরে কালো তরলে ভর্তি। 'ডেভিড লিভিংস্টোনের সম্পত্তির ভেতর থেকে এই জিনিসটা পেয়েছি আমরা। এক নুবিয়ান যোদ্ধার ছেলেকে বাঁচিয়েছিল ডেভিড। সেই যোদ্ধা উপহার হিসেবে ওকে দিয়েছিল এক প্রাচীন তালিসমান। ছোট পাত্রটা মোম দিয়ে সিল করা ছিল, ওটার দেহে খোদাই করা ছিল অসংখ্য হায়ারোগ্লিফ। যাই হোক, ওই তালিসমানের ভেতরে যে পানি পাওয়া গিয়েছিল, এই ভায়ালে সেটাই আছে। ওই নুবিয়ান যোদ্ধার দাবী ছিল, এই পানিটা নীল নদের!'

শ্রাগ করলেন টোয়েন। 'তো? তাতে কী যায় আসে?'

এক পা পিছিয়ে এসে ভায়ালটাকে আলোতে ধরলেন স্ট্যানলি। ভেতরের তরলটুকুর রঙ উজ্জ্বল লাল বলে মনে হলো।

'লিভিংস্টোনের লেখা অনুসারে, এই পানির বয়স হাজার বছরেরও বেশি। যখন নীল নদের পানি রক্তে পরিণত হয়েছিল, তখন সংগ্রহ করা হয়েছিল এটি।'

'রক্তে পরিণত হয়েছিল মানে?' জানতে চাইলেন নিকোলা। 'ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই মহামারীর কথা বলছেন?'

হাসলেন টোয়েন। তার সন্দেহ, স্ট্যানলি ওদেরকে বোকা বানাতে চাইছেন। 'তোমার দাবী, মোজেস যখন নীল নদের পানি রক্তে পরিণত করলেন, তখনকার সময়ের নমুনা এটা?'

'জানি কথাটা কেমন শোনাচ্ছে।' স্ট্যানলির চেহারা গম্ভীর।

'অসম্ভব একটা-'

'রয়্যাল সোসাইটির বাইশ জন মানুষ মারা গিয়েছেন। ওই তালিসমান যখন প্রথম খুলে ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়, তখন মৃত্যু বরণ করেছেন তারা।'

চুপ হয়ে গেলেন টোয়েন।

'কীভাবে মারা গেলেন?' কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলেন টেসলা। 'বিষ ছিল নাকি?'

মলিন হয়ে গিয়েছেন স্ট্যানলি। এই ভদ্রলোক ভয়ঙ্কর সব প্রাণীর মোকাবেলা করেছেন, প্রাণঘাতী জ্বরকে দেখিয়েছেন কাঁচকলা, নরখাদক অসভ্যরা তাকে রুখতে পারেনি। অথচ সেই মানুষের চেহারায় এখন ভয়ের আভা!

'বিষ না।'

'তাহলে?'

গাম্ভীর্য অটুট রেখে স্ট্যানলি জবাব দিলেন। 'অভিশাপ। প্রাচীন এক প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তারা। এই পানিটুকু যে মিশরীয়দের উপর মহান প্রভুর অভিশাপ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি আমরা একে না থামাই, তাহলে সামনে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে-তা এক ঈশ্বরই জানেন।'

'আমাদের কী করণীয়?' জানতে চাইলেন টোয়েন।

নিকোলার দিকে ফিরলেন স্ট্যানলি, 'আমার সাথে ইংল্যান্ডে আসুন।'

'কেন?' আবারও জানতে চাইলেন টোয়েন।

'পরবর্তী মহামারীটাকে থামাবার জন্য।'

পর্ব এক

মমিকরণ

এক

বর্তমান সময়
২৮ মে, সকাল ১১:৩২ ই.ই.টি.
কায়রো, মিশর

করোনারের অনিশ্চিত ভঙ্গি দেখে ডেরেক র‍্যাঙ্কিন বুঝতে পারল-কিছু একটা ঘাপলা আছে। 'লাশটা দেখান।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মর্গের এলিভেটরের দিকে ইঙ্গিত করল ড. বাডাউই। 'আসুন আমার সাথে।'

করোনারের পিছু পিছু এগোনোর ফাঁকে নিজের দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল ডেরেক। জানে না, ব্যাপারটা তাদের উপর কী রকম প্রভাব ফেলবে। দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মেয়েটার নাম সাফিয়া আল-মায়াজ, জেন ম্যাককেবের চাইতে এক মাথা উঁচু। আজ সকালে একটা প্রাইভেট জেটে চেপে লন্ডন থেকে কায়রো এসেছে সবাই, এখন এগোচ্ছে শহরের মর্গের দিকে।

একুশ বছর বয়সী জেনের প্রতি স্নেহ-সুলভ ব্যবহার করছে সাফিয়া। ডেরেকের নজর স্থির হলো তার উপর, প্রশ্ন করছে চোখের ভাষায়-মেয়েটা নিজেকে সামলাতে পারবে তো?

বড় করে শ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল সাফিয়া। পেশায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কিউরেটর সে। চার বছর আগে যোগদান করা ছেলেটা কাজ করে তার জুনিয়র হিসেবে। জৈব-প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় দক্ষ ডেরেকের দায়িত্ব-দাঁত, কঙ্কালতন্ত্র, পেশী ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন আমলের মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তদন্ত করা। অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানও তার কাজের আওতায় পড়ে। এর আগে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের সাথে কাজ করার সময় ইউরোপের ব্ল্যাক ডেথ, আয়ারল্যান্ডের মহা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়েও তদন্ত করেছে সে।

ডেরেকের বর্তমান কাজ হলো-নীল নদের ষষ্ঠ জলপ্রপাত থেকে উদ্ধার করা কতগুলো মমির ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। সুদানের ওই জায়গাটাতে নতুন একটা বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। এমনিতে অবশ্য জায়গাটা নিয়ে কারও আগ্রহ ছিল না। তবে বাঁধের কাজ শুরু হওয়ার পর সুদান আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির মাথায় ভূত চেপেছে-ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগেই ওই অঞ্চল থেকে যতটুকু সম্ভব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো উদ্ধার করতে হবে। এ কাজে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাহায্য চেয়েছে তারা। অনেক দিন ধরেই কাজ চলছে। প্রজেক্টের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত-

প্রাচীন লিপি খোদাই করা বেশ কিছু মূল্যবান পাথর ছাড়াও, একটা ছোট-খাটো নুবিয়ান পিরামিডের মোট তিনশো নব্বইটা টুকরো উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে বলা হয়ে থাকে, জায়গাটা অভিশপ্ত। দুই বছর আগে, একটা গোটা সার্ভে টিমসহ প্রজেক্টের প্রধান রিসার্চার উধাও হয়ে যান। কয়েক মাস অনুসন্ধানেও কিছু জানতে না পারায়, বাধ্য হয়ে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে দেয়া হয়। সার্ভে টিমের প্রায় অর্ধেক লোক স্থানীয় সুদানিজ। অবশ্য আরব বিদ্রোহী ও ডাকাত অধ্যুষিত এরকম একটা এলাকায় অনুপ্রবেশ করা সিদ্ধান্তটাও সঠিক ছিল না। ভুলের মাশুল সম্ভবত নিজেদের জীবনের বিনিময়ে চুকাতে হয়েছে তাদের। এখনও কোন বিদ্রোহী গ্রুপ দায় স্বীকার করেনি যদিও।

ঘটনাটার পর নড়ে-চড়ে বসে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। একগুঁয়েমির জন্য 'কুখ্যাত' হলেও, নিজ কর্মক্ষেত্রে টিম লিডার প্রফেসর হ্যারল্ড ম্যাককেবের প্রচুর নাম-ডাক। ডেরেকের শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি, লন্ডন ইউনিভার্সিটির বৃত্তি-লাভের ব্যাপারেও সহায়তা করেছিলেন ভদ্রলোক। খুব ভালো সম্পর্ক ছিল দু'জনের। তার নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েই এই কাজে আগ্রহী হয় ডেরেক।

তাই আজ যখন প্রফেসরের মৃত্যুসংবাদ কানে এল, বিচলিত না হয়ে পারেনি সে। কিন্তু তিনজনের এই দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের তুলনায়, তার কষ্টটুকু আসলে কিছুই না।

এলিভেটরে ঢুকে পড়েছে জেন ম্যাককেব, হ্যারল্ড ম্যাককেবের মেয়ে। হাত দুটো আড়াআড়ি ভঙ্গিতে বুকে ধরা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে নাকের নিচে আর কপালে। মর্গ বিল্ডিং-এর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেনি একটুও। তবে ডেরেক জানে, এই ঘামের কারণ গরম নয় . . . দুশ্চিন্তা।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই মেয়েটার হাত স্পর্শ করল সাফিয়া। 'জেন, তুমি বরং এখানেই থাক। তোমার বাবাকে আমি ভাল করেই চিনি। শনাক্ত করার কাজটা আমি একাই সারতে পারব।'

মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন জানাল ডেরেক। সামনে এক পা বাড়িয়ে দিয়েছে, দরজা বন্ধ হতে গেলে আটকাবে।

কঠিন হয়ে এল জেনের দৃষ্টি। 'না। কাজটা আমাকেই করতে হবে। দুটো বছর ধরে উত্তরের খোঁজে আছি। বাবার কথা . . . ভাইয়ের কথা . . .'

মেয়েটার গলা ধরে এসেছে। বিব্রতবোধ করল সাফিয়া। জানে, নিখোঁজ হওয়ার সময় হ্যারল্ড ম্যাককেবের সাথে তার ছেলেও ছিল। ছয় বছর আগে জরায়ু ক্যান্সারে মা মারা যাওয়ার পর, একইসাথে বাবা আর ভাইকে হারিয়ে অকুল সাগরে পড়ে জেন।

এগিয়ে গিয়ে এলিভেটরের দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সাফিয়ার মুখ দিয়ে।

ডেরেক জানত, এরকমই একটা উত্তর দেবে জেন। বাবার স্বভাব পেয়েছে ও . . . মেধার পাশাপাশি একগুঁয়েমিও আছে সমান তালে। প্রফেসর ম্যাককেবের সাথে পরিচয়ের পরপরই জেনের সাথে পরিচয় হয় তার। একই ইউনিভার্সিটিতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট করছিল ষোলো বছর বয়সী মেয়েটা। আর উনিশ বছরেই পেয়ে যায় নৃতত্ত্বে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি। এখন যুক্ত আছে একটা পোস্ট-ডক্টরাল প্রোগ্রামে। ঠিক যেন বাবার প্রতিচ্ছবি।

চলতে শুরু করেছে এলিভেটর। দুই সঙ্গিনীর মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছে না ডেরেক। প্রত্নতত্ত্বের ব্যাপারে দু'জনেরই ব্যাপক আগ্রহ। সাফিয়ার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা। মাথার লম্বা কালো চুলগুলো অর্ধেক ঢাকা পড়েছে স্কার্ফের নিচে। পরনে কালো রঙের ঢোলা পায়জামা আর নীলচে ফুলহাতা ব্লাউজ। মৃদুভাষী হলেও নেতৃত্বদানের জন্য উপযুক্ত। পান্নার মতো সবুজ, শীতল চোখের দৃষ্টি থমকে দিতে পারে যে কোন পুরুষকে।

অন্যদিকে, গায়ে-গতরে বাবার মতো স্কটিশ ধাঁচ পেয়েছে জেন। ববকাট চুলগুলো ব্যক্তিত্বের মতোই আগুন-রঙা। তবে পথে-প্রান্তরে ঘুরে গায়ের চামড়া তামাটে করে ফেলেছিলেন প্রফেসর, অধিকাংশ সময় ল্যাবে থাকায় সে সুযোগটা জেন পায়নি। তাই এখনও ফর্সাই আছে ও, শুধু নাকের ডগা আর গালের দুই পাশে মেয়েলী লালচে আভা।

ঝাঁকি খেয়ে থামল এলিভেটর। দরজা খুলে যেতেই জীবাণু-নাশকের গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। প্যাসেজওয়ে ধরে সামনে থেকে পথ দেখাচ্ছে ড. বাডাউই। ছোট-খাটো গড়নের লোকটার পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ল্যাবকোট। ভাব দেখে মনে হচ্ছে-যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ঝামেলাটা ঘাড়ের উপর থেকে ফেলতে চাইছে।

হলওয়ের শেষ মাথায়, একটা ছোট ঘরে ঢুকল করোনার। অনুসরণ করছে বাকিরা। ঘরের একেবারে মাঝখানে, ইস্পাতের টেবিলের ওপর একটা লাশ ঢেকে রাখা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল করোনার, দৃষ্টি ডেরেকের দিকে। 'মনে হয়, আপনার আগে দেখা উচিত। মেয়েরা আপাতত বাইরে থাকুক।'

'না,' প্রতিবাদ করল জেন। 'আমাকে নিশ্চিত হতে হবে, লাশটা বাবার কি না।'

মেয়েটার মনোভাব উপলব্ধি করতে পারছে ডেরেক। দুই বছর বেশ দীর্ঘ সময়। অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে থাকতে সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। এবার মুক্তি চায়।

'চলুন, দেখা যাক।' বিড়বিড় করে বলল সাফিয়া।

মাথা নেড়ে টেবিলের দিকে এগোল করোনার। প্লাস্টিকের শিটটা তুলতেই বেরিয়ে এল লাশের ঊর্ধ্বাঙ্গ।

আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল ডেরেক। এই লাশটা হ্যারল্ড ম্যাককেবের হতেই পারে না! অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যেন শত শত বছর ধরে বালির নিচে পড়ে ছিল লাশটা। চোয়াল আর পাঁজরে হাড়ের গায়ে বসে গিয়েছে চামড়া। কোথাও একরত্তি মাংস নেই। চামড়ার রঙটাও কেমন যেন চকচকে, যেন বার্নিশ করা হয়েছে।

তবে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠতেই খুলিতে লেগে থাকা ধূসর, লালচে চুলের দিকে আটকে গেল ডেরেকের নজর। গাল আর থুতনির দাড়িও একই রঙের। মুখের আদলটাও বেশ পরিচিত।

জেনও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল তার গলা বেয়ে। 'বাবা!'

পিছিয়ে এসে সাফিয়ার বুকে মুখ গুঁজল মেয়েটা, ফোঁপাচ্ছে অনবরত। তবে সাফিয়ার ভঙ্গি স্থির। ভ্রূ কুঁচকে লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

তার মনের কথা ধরতে পেরেছে ডেরেক। করোনারের উদ্দেশ্যে বলল, 'দিন দশেক আগে, মানে খোঁজ পাওয়ার সময়, প্রফেসর ম্যাককেব নাকি জীবিত ছিলেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ড. বাডাউই। 'যাযাবরদের একটা পরিবার তাকে মরুভূমিতে খুঁজে পায়, রুফা শহরের এক কিলোমিটার দূরে। ঠেলাগাড়িতে করে তাকে শহরে নিয়ে আসা হচ্ছিল। কিন্তু পৌঁছানোর আগেই মারা যান প্রফেসর।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' সাফিয়া মন্তব্য করল। 'লাশটা দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ পুরনো।'

ডেরেকও কথাটার সাথে একমত। তবে আরেকটা ব্যাপারটা ওকে খোঁচাতে শুরু করেছে। 'আপনি বলেছেন, দুই দিন আগে ট্রাকে করে লাশটা এখানে আনা হয়। প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর কেউ এটা স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। গাড়িটাতে কি রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা ছিল?'

'না। কিন্তু মর্গে আনার পর লাশটা কুলারে রাখা হয়।'

সাফিয়ার দিকে তাকাল ডেরেক। 'মৃত্যুর পর প্রায় দশদিন গরম পরিবেশে ছিল লাশটা। কিন্তু পচনের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। এমনকী চামড়ায় একটা ভাঁজ পর্যন্ত না!'

একমাত্র ক্ষত বলতে শুধু পোস্টমর্টেমের লম্বা কাটা দাগটা। লন্ডন থেকে আসার পথে করোনারের পাঠানো রিপোর্টে চোখ বুলিয়েছে ডেরেক। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি, অতিরিক্ত গরম আর পানিশূন্যতাকেই সম্ভাব্য কারণ হিসেবে

বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত-প্রফেসরের ম্যাককেবের নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত আসল কাহিনির ছিটেফোঁটাও এই পরীক্ষায় ধরা পড়েনি।

নীরবতা ভাঙল সাফিয়া। 'ওই যাযাবরদের ব্যাপারে কিছু জানা গিয়েছে? মৃত্যুর আগে প্রফেসর তাদের কিছু বলেননি? তার ছেলে কিংবা দলের বাকিদের সম্পর্কে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লোকটা। 'খুব অসুস্থ আর দুর্বল ছিলেন তিনি। তাছাড়া যাযাবর লোকগুলো আরবী ছাড়া আর কিছু জানে না।'

'বাবা ভালোই আরবী বলতে পারতেন।' জোর দিল জেন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল করোনার। 'একটা ব্যাপার রিপোর্টে লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। যাযাবরদের একজন জানিয়েছে, প্রফেসর নাকি বলছিলেন-কোন এক দানব তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।'

ভ্রূকুটি করল সাফিয়া। 'দানব?'

শ্রাগ করল ডক্টর। 'ওই যে বলছিলাম . . .পানিশূন্যতায় ভুগছিলেন তিনি। ওই অবস্থায় ভ্রম হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'আর কিছু?'

'আর বিড়বিড় করে একটাই শব্দ উচ্চারণ করছিলেন শুধু।'

'কী?'

জেনের উপর স্থির হলো করোনারের নজর। 'জেন।'

নিজের নাম শুনে কেঁপে উঠল মেয়েটা। সাফিয়া তাকে শান্ত করার সময়টুকু লাশটা ভালোভাবে দেখার কাজে ব্যয় করল ডেরেক। শক্ত হয়ে গিয়েছে চামড়া। টেনেটুনে দেখা গেল, বেশ মোটাও। হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে আঙুলের নখ।

বাডাউইর দিকে ফিরল ডেরেক। 'রিপোর্টে তো লেখা ছিল, লাশের পেটে একই আকারের বেশ কিছু ছোট ছোট পাথরের টুকরো পাওয়া গিয়েছে।'

'হ্যাঁ। কোয়েল পাখির ডিমের সমান।'

'গাছের বাকলও নাকি ছিল?

মাথা নেড়ে সায় দিল করোনার। 'মনে হয়, খিদের জ্বালায় সামনে যা পাচ্ছিলেন তাই মুখে ঢোকাচ্ছিলেন তিনি।'

'আরও একটা কারণ থাকতে পারে।'

'কী?' জানতে চাইল সাফিয়া।

পিছিয়ে এল ডেরেক। 'এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। তবে সবার আগে, মস্তিষ্কের একটা স্ক্যান করাব আমি।'

'কী ভাবছ তুমি?' জোর দিল সাফিয়া।

'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, মমিকরণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসর ম্যাককেব।'

ভ্রূ কুঁচকালো বাডাউই। 'তা কীভাবে সম্ভব? আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মৃত্যুর পর কেউ লাশটাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।'

মাথা নাড়ল ডেরেক। 'ভুল বুঝছেন আপনি। আমি বলিনি তাকে মৃত্যুর পর মমি করা হচ্ছিল।' এই পর্যন্ত বলে তাকাল সাফিয়ার দিকে। 'প্রক্রিয়াটা তার বেঁচে থাকার সময়ই শুরু হয়েছে!'

বিকেল ৪:৩২

পাঁচ ঘণ্টা পর . . .

কম্পিউটার স্ক্রিনের উপর ঝুঁকে আছে ডেরেক। মাথার উপরের জানালা দিয়ে একটা এম.আর.আই. স্যুইট দেখা যাচ্ছে: লম্বা টেবিলের উপর বিশালাকৃতি সাদা ম্যাগনেটিক টিউব।

রাজনৈতিক জটিলতায় আগামীকালের আগে প্রফেসরের মৃতদেহ ইংল্যান্ডে নেয়া সম্ভব না। তাই লাশটা পচতে শুরু করার আগেই কাজে নেমেছে ডেরেক। চামড়ার বায়োপ্সিসহ চুলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের সময় কেটে বের করা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও নিয়ে নেয়া হয়েছে করোনারের কাছ থেকে, ডিম আকৃতির পাথরের টুকরো এবং পরিপাক না হওয়া গাছের বাকলও সেসবের ভেতর আছে। পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের এম.আর.আই. ফ্যাসিলিটি ব্যবহারের অনুমতি যোগাড় করে দিয়েছে লোকটা নিজেই।

দ্বিতীয় স্ক্যান রিপোর্টে চোখ বুলাল ডেরেক। পর্দায় প্রফেসর ম্যাককেবের মাথার লম্বচ্ছেদের একটা প্রতিকৃতি ফুটে আছে। ক্রানিয়ামের উত্তল অংশ, নাকের ফুটো, অক্ষি-কোটর . . . সব ধরা পড়েছে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র আর রেডিয়ো ওয়েভের কারসাজিতে, বাদ যায়নি কিছুই। কিন্তু মস্তিষ্কটাকে দেখাচ্ছে বিবর্ণ ধূসর পদার্থ-রূপে, এমনটা সে আশা করেনি।

'প্রথম রিপোর্টটাই তো ভালো ছিল,' মন্তব্য করল সাফিয়া।

মাথা নেড়ে সায় দিল ডেরেক। প্রথম স্ক্যানে সেরেব্রামের জাইরাই ও সালকাইসহ আরও কিছু বিস্তারিত জিনিস ধরা পড়েছিল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার স্ক্যান করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কিন্তু এবারের রিপোর্ট আগেরটার চাইতেও ধোঁয়াশাময়।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ডেরেক। 'বুঝতে পারছি না, এই ত্রুটিটা কি এম.আর.আই মেশিনের? নাকি ময়নাতদন্তের সময় মস্তিষ্কে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে . . .'

'আরেকবার স্ক্যান করবে নাকি?'

মাথা নাড়ল ডেরেক। সেই সুযোগ নেই। ইতিমধ্যে মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে প্রফেসরের মৃতদেহ। 'লাশে পচন ধরার আগেই যা করার করতে হবে। করোনারকে সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড সংগ্রহ করতে বলে দিয়েছি। সেই সাথে মস্তিষ্কটা বের করে নিয়ে ফরমালিনে সংরক্ষণ করে রাখা হবে। লন্ডনে ফিরে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব।'

ভ্রূকুটি করল সাফিয়া। 'জেন এসবের ব্যাপারে জানে তো?'

'হ্যাঁ। হোটেলে ফেরার আগে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি।'

বাবার লাশ শনাক্ত করার পর, দরকারি কাজগুলো সারতে সারতে আরও যেন নেতিয়ে পড়ছিল মেয়েটা। ওই অবস্থাতেই যা যা করতে চায়, তা সংক্ষেপে মেয়েটাকে জানায় ডেরেক। জেনও বাধা দেয়নি। আসলে তারও উত্তর চাই। তবে ব্যাপারটা নিজে তদারকি করার মতো দৃঢ়তা পাচ্ছিল না। ডেরেক যদি তার হয়ে কাজটা করতে চায়, তাতে ক্ষতি কী!

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সাফিয়া। 'তাহলে তো আপাতত আর কিছু করার নেই।'

মাথা নাড়ল ডেরেক। 'মর্গে গিয়ে দেখি সব ঠিকঠাক-ভাবে চলছে কি না। আপনি বরং জেনের কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা . . .'

ফোন বেজে ওঠার আওয়াজে ছেদ পড়ল কথায়। টেকনিশিয়ান কানে তুলে নিল রিসিভার, অল্প কয়েকটা কথা বলে বাড়িয়ে দিল ডেরেকের দিকে। 'করোনার ফোন করেছেন। আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

ভ্রূ কুঁচকে রিসিভারটা কানে ঠেকাল ডেরেক। 'ড. র‍্যাঙ্কিন বলছি।'

'তাড়াতাড়ি আসুন,' হড়বড় করে বলল বাডাউই। 'একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।'

প্রশ্ন করেও বিস্তারিত কিছু জানা গেল না। শুধু বলা হলো, তাড়াতাড়ি মর্গে পৌঁছাতে।

রিসিভার নামিয়ে ব্যাপারটা সাফিয়াকে ব্যাখ্যা করল ডেরেক।

'আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে।'

তড়িঘড়ি করে হাসপাতাল থকে বেরিয়ে এল দু'জন। মর্গটা এখান থেকে দুই ব্লক দূরে। বেশ কিছুক্ষণ বিল্ডিং-এর ভেতরে থাকার পর সূর্যের আলো সরাসরি চোখে লাগছে। বাতাসও বেশ গরম।

'ডেরেক,' সাফিয়া বলল। 'তুমি বলেছিলে, প্রফেসরের সাথে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যুর আগে মমিকরণ . . . মানে কী?'

নিশ্চিত হওয়ার আগে মুখ খুলতে চাচ্ছে না ছেলেটা। 'প্রমাণ নেই কোন, শুধুমাত্র আমার ধারণা বলতে পারেন।'

'তবুও,' জোর দিল সাফিয়া। 'বুঝিয়ে বলো।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেরেক। 'আত্ম-মমিকরণ বলা হয় ব্যাপারটাকে, যেখানে জীবিত ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় মৃত্যুর পর শরীরটাকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। জাপান, চীনসহ পূর্বদিকের অনেক দেশে এসবের প্রচলন আছে। এমনকি ভারত আর মধ্যপ্রাচ্যেও কিছু কিছু গোষ্ঠীতে নিয়মটা দেখা যায়।'

'কিন্তু এ তো আত্মহত্যা!'

'তা-ও বলা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা প্রধানত আধ্যাত্মিক, অমর হওয়ার পন্থা। এসব মানুষদের ধারণা-এতে বিশেষ শক্তি ভর করবে মমিগুলোতে।'

নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় আওয়াজ করল সাফিয়া।

শ্রাগ করল ডেরেক। 'ধারণাটা কিন্তু বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত, বিচ্ছিন্ন কিছু না। ক্যাথলিকরাও মনে করে, সাধুবাদের অন্যতম প্রমাণ হলো মৃত্যুর পরেও দেহ সংরক্ষিত থাকা।'

ফিরে তাকাল সাফিয়া। 'তা বুঝলাম। কিন্তু কেউ কীভাবে নিজেকেই মমি বানায়?'

'প্রক্রিয়াটা অবস্থানভেদে ভিন্ন। তবে সাধারণ কিছু নিয়ম আছে। সর্বপ্রথম-কাজটা বেশ সময়সাপেক্ষ, বছরের পর বছরও লাগতে পারে। শুরুর কাজ হলো দানাদার সব খাবার পরিত্যাগ করা। টিকে থাকতে হয় শুধুমাত্র বিশেষ কিছু বাদাম, পাইন ফল, জাম এবং রেসিনসমৃদ্ধ গাছের বাকলের উপর। জাপানে প্রক্রিয়াটা পরিচিত মোকুজিক্যু নামে, এই পদ্ধতি অনুসরণকারী লোকদের ডাকা হয় সোকুশিনবুতসু, যার মানে-'রক্ত-মাংসের বুদ্ধ।''

'করোনারের জানাল-লাশের পেটে গাছের বাকল পাওয়া গিয়েছে। তার ভিত্তিতেই কি এসব ভাবছ?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ডেরেক। 'তাছাড়া প্রফেসরের পেটে পাথরের ছোট ছোট টুকরোও ছিল। সোকুশিনবুতসু মমির পেট এক্স-রে করে পাথরের টুকরোর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে।'

'কিন্তু এভাবে কি মৃত্যুর পর দেহ সংরক্ষণ সম্ভব?'

'বলা হয়ে থাকে-এসব লতা-গুল্ম, রেসিন ইত্যাদি মৃত্যুর পর লাশের গায়ে জন্মানো ব্যাকটেরিয়ার বিস্তারে বাধা দেয়। কাজ করে ফরমালিনের মতো সংরক্ষণকারী তরল হিসেবে।'

চিন্তায় ডুবে গেল সাফিয়া।

'শেষ ধাপে নিজেদের কোন একটা বদ্ধ জায়গায় আটকে ফেলে লোকগুলো। তবে সেখানে বাতাস চলাচলের মতো ছোট ফাঁক রাখা হয়। জাপানে ভিক্ষুরা নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলার পর, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অবিরাম একটা ঘণ্টা বাজাত। ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে গেলেই, বাইরে থাকা সহযোগীরা বাতাস চলাচলের পথ আটকে

দিয়ে সিল করে দিত জায়গাটা। তিন বছর পর খুলে দেখা হতো, ভিক্ষু সফল হয়েছে কি না।'

'তারপর?'

'তারপর লাশটা সঠিক উপায়ে রক্ষিত আছে দেখতে পেলে ধোঁয়ায় শুকানো হতো, যাতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া আরও পাকাপোক্ত হয়।'

'তোমার মতে, হ্যারল্ডও এই পথ অনুসরণ করছিলেন?'

মাথা নাড়ল ডেরেক। 'কিংবা হয়তো তাকে বাধ্য করা হচ্ছিল। তবে যেটাই হোক না কেন, প্রক্রিয়াটা শেষ করতে পারেননি প্রফেসর। লাশ দেখে যতদূর ধারণা করতে পারছি, খুব সম্ভবত অনাহার শুরু করার পর মাত্র দুই কি তিনমাস পেরিয়েছে।'

'তোমার ধারণা সঠিক প্রমাণ হলে, সার্ভে টিমটাকে কে বা কারা অপহরণ করেছিল, এ ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ। এটাও জানা যাবে, বাকিরা এখনও জীবিত আছে কি না। হয়তো বন্দি বানানো হয়েছে জেনের ভাই রোরিসহ সবাইকে। একই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরাও। সমাধানটা তাড়াতাড়ি বের করতে পারলে হয়তো জীবিত উদ্ধারও করা যাবে।'

কেঁপে উঠল সাফিয়ার ঠোঁটজোড়া। 'ওগুলো কোন গাছের বাকল, সেটা বের করতে পারবে?'

'আশা করি পারব।'

কথা বলতে বলতে মর্গে পৌঁছে গিয়েছে দু'জন। সদর দরজা পেরিয়ে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। বাইরের তুলনায় এখানকার আবহাওয়া শতগুণ শীতল। ওদের দেখতে পেয়ে লবি ধরে এগিয়ে এল সবুজ পোশাক পরা ছোট-খাটো এক মহিলা। 'ড. বাডাউই সরাসরি তার কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন আপনাদের।'

মহিলার চোখে ফুটে ওঠা ভয়ের আভাস পেল ডেরেক। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ নয়, এ ভয়ের কারণ অন্য কিছু। তাড়াতাড়ি এগোনোর প্রয়াস পেল সে।

আরও এক সেট সিঁড়ি পেরিয়ে মর্গের অন্য প্রান্তে, একটা অবজার্ভেশন রুমে হাজির হলো সবাই। জায়গাটা প্যাথলজি ল্যাবের মতো দেখতে। জানালার ওপাশে, ঘরের একেবারে মাঝখানে একটা স্টিলের টেবিল। উপর থেকে ঝুলছে হ্যালোজেন ল্যাম্প। হাসপাতাল আর মর্গ দুটোর সাথেই কায়রো ইউনিভার্সিটি স্কুলের মেডিসিন বিভাগের সম্পৃক্ততা আছে। সম্ভবত এই ঘরটা ময়নাতদন্তের ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তবে এখন বাইরের লোক বলতে শুধু ডেরেক আর সাফিয়া। ল্যাবে টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে ছোট একটা দল। সবার পরনে ল্যাব-কোট, সেই সাথে মুখ ঢাকা

মাস্কে। ওদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে মুখের সামনে একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন তুলে ধরল বাডাউই। জানালার উপর লাগানো স্পিকারে ভেসে এল তার কণ্ঠ।

'কাহিনি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে প্রফেসরের মস্তিষ্ক বের করার আগে আমার মনে হয়, ব্যাপারটা আপনাদের দেখা উচিত। পাশাপাশি সবকিছু রেকর্ডও করে রাখা হচ্ছে।'

'কী হয়েছে?' গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করল ডেরেক। তবে চেঁচানোর দরকার ছিল না। হাত তুলে জানালার পাশে ইন্টারকমের দিকে ইঙ্গিত করল পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা মহিলা। এগিয়ে গিয়ে আবারও প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করল সে।

দলের বাকিদের টেবিলের সামনে থেকে সরে যেতে ইশারা করল বাডাউই। ষাট বছর বয়সী প্রত্নতত্ত্ববিদের দেহ হ্যালোজেন ল্যাম্পের নিচে পুরোপুরি নগ্ন, শুধু কোমরের উপর ছোট এক টুকরো কাপড় রাখা। টেবিলটা ঈষৎ কাত করা, যেন জানালা দিয়ে লাশটার মাথা পরিষ্কার দেখা যায়।

'ইতিমধ্যে আপনার কথা অনুযায়ী সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড সংগ্রহ করেছি,' ব্যাখ্যা করল বাডাউই। 'তারপর নজর দেই মস্তিষ্কের দিকে।'

মাথা ঢেকে রাখা কাপড়ের টুকরোটা সরিয়ে দিল করোনার। দেখা গেল, ইতিমধ্যে মাথার পেছনের চামড়া আলাদা করে খুলির হাড়ও কেটে ফেলা হয়েছে। আলতো হাতে উত্তল হাড়ের টুকরোটা তুলে নিল বাডাউই। এদিক দিয়েই বের করে আনা হবে মগজ।

চোখের কোনা দিয়ে সাফিয়ার দিয়ে তাকাল ডেরেক। উদ্দেশ্য-দৃশ্যটা তার উপর কোন প্রভাব ফেলছে কি না দেখা। মোটামুটি শান্তই আছে কিউরেটর। প্রতিক্রিয়া বলতে শুধু মুঠো হয়ে গিয়েছে দুই হাত।

হাড়ের খণ্ডটা একপাশে রেখে সরে দাঁড়াল করোনার। হ্যালোজেনের আলোয় ডেরেক দেখতে পেল, ফাঁক ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছে মেনিনজিয়াল টিস্যুর পরতে পরতে সাজানো প্রফেসরের মস্তিষ্কের গোলাপি-ধূসর অংশ।

আনমনা হয়ে গেল ছেলেটা। এই তাহলে তার গুরুর সব প্রতিভার উৎস। কত রাত একসাথে জঙ্গলে কাটিয়েছে তারা, কত শত কথাবার্তা-সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অভিযান থেকে শুরু করে ফুটবল বিশ্বকাপ . . . একগুঁয়েমির পাশাপাশি লোকটার মনে দয়ামায়ারও কমতি ছিল না। সেই সাথে ছিল স্ত্রী আর দুই সন্তানের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা।

এখন আর সেসবের কিছুই নেই . . .

এসব ভাবতে ভাবতে বাডাউইর বলা প্রথম কয়েকটা শব্দ শুনতে পেল না ডেরেক। ' . . . দেখুন।'

নিজের দলের একজনের উদ্দেশ্যে ইশারা করল করোনার। এগিয়ে গিয়ে সার্জিক্যাল ল্যাম্পের সুইচ বন্ধ করে দিল লোকটা। অন্ধকার নেমে এল ঘরে।

কয়েকবার চোখ পিটপিট করল ডেরেক। মাথায় ঢুকছে না, কেন আলোটা নিভিয়ে দেয়া হলো। পরক্ষণেই চোখের সামনে দেখতে পেল অভাবনীয় দৃশ্যটা। সাফিয়াও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে এল সে।

অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে প্রফেসরের খুলির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে থাকা মেনিনজিয়াল টিস্যুসহ মস্তিষ্কের অংশটুকু . . . কেমন যেন একটা গোলাপি আভা ছড়াচ্ছে।

'আগে আরও উজ্জ্বল ছিল,' ব্যাখ্যা করল বাডাউই। 'এখন একটু কম।'

'এরকম কেন হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল সাফিয়া। ডেরেকের মনেও উঁকি দিচ্ছে একই প্রশ্ন।

পথে আসতে আসতে সাফিয়াকে বলা কথাগুলো মনে করল ডেরেক। আত্ম-মমিকরণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাওয়া লোকেদের ধারণা ছিলঃ বিশেষ ক্ষমতার ধারণ-পাত্র হিসেবে নিজেদের শরীরকে কাজে লাগানো।

এই কি সেই বিশেষ শক্তি?

তার দিকে ফিরে তাকাল সাফিয়া। 'অনেক হয়েছে, আর কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। এখনই লাশটা ব্যাগে ঢুকিয়ে সিল করে দেয়া হোক। লন্ডনে ফিরতে হবে।'

তার কণ্ঠে ফুটে ওঠা উদ্বেগ উপলব্ধি করতে পারছে ডেরেক। 'কিন্তু কাজটা তো আগামীকালের আগে করা সম্ভব না।'

'আমি ব্যবস্থা করছি,' আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিল সাফিয়া।

'তবুও,' জোর দিল ডেরেক। 'চোখের সামনে যা দেখলাম, পুরোটাই ব্যাখ্যার অতীত। সামনে এগোতে হলে সাহায্য প্রয়োজন হবে।'

দরজার দিকে ফিরল সাফিয়া। 'সাহায্য করতে পারবে, পরিচিত এমন একজন আছে।'

'কে?'

'এক পুরনো বন্ধু . . . আগে থেকেই ওর কাছে আমি ঋণী।'

দুই

৩০ মে, সকাল ১১:৪৫ ই.ডি.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ডেস্কের পেছনে বসে স্মৃতিচারণ করছে পেইন্টার।

মনিটরে ফুটে আছে সাফিয়া আল-মায়াজের ছবি। শেষ দেখা হয়েছিল এক দশক আগে, রাব-আল খালির ঊষর মরুভূমিতে। পুরনো স্মৃতিগুলো দোলা দিয়ে যাচ্ছে মনে। বিশেষ করে মেয়েটার হাসি . . . এতদিন পর কথা-বার্তা হওয়ায় সাফিয়া নিজেও খুশি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তখন সিগমার সাধারণ ফিল্ড এজেন্ট ছিল পেইন্টার। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে দক্ষ এবং সেই সাথে সাবেক স্পেশাল ফোর্স সৈনিকদের নিয়োগের মাধ্যমে, ডারপার অধীনে সবেমাত্র গোড়াপত্তন হয়েছে এই এজেন্সির। ডিরেক্টরের পদে ছিলেন শন ম্যাকনাইট।

এক দশক পর, আজ ডিরেক্টরের আসনে পেইন্টার স্বয়ং। সেই সাথে পাল্টেছে আরও অনেক কিছু।

হাত তুলে নিজের কানের দিকে ইঙ্গিত করল সাফিয়া, পেইন্টারের পাকা চুলের দিকে নজর। 'নতুন কী যেন দেখা যায়!'

নিজেও একই ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করল পেইন্টার। মাথার দু'পাশে, কানের উপর সাদাটে রঙ ধারণ করেছে একগোছা চুল। হঠাত দেখলে মনে হয়-বকের পালক গুঁজে রেখেছে কানের উপরের খাঁজে।

ভ্রূকুটি করল সিগমা ডিরেক্টর। 'যতদূর জানি, চেহারাতেও বয়সের ছাপ পড়েছে।'

সে হাত নামানোর আগেই আরও একটা পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করল সাফিয়া। 'আরে ওটা কী? বিয়ের আঙটি নাকি!'

মুচকি হাসল পেইন্টার। 'হ্যাঁ। কেউ একজন দয়া করে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে আরকি . . .'

'তোমাকে পেয়ে সে ভাগ্যবতী।'

'উল্টোটাই বরং সত্যি,' হাত নামাতে নামাতে মন্তব্য করল সিগমা ডিরেক্টর। 'ওমাহা কী করছে আজকাল?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সাফিয়া। ড. ওমাহা ডান এক আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ, ওর স্বামী। 'ভাই ড্যানিকে নিয়ে ভারতে এক অভিযানে গিয়েছে ও, সে-ও প্রায় মাস-

খানেক হলো। যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু জায়গাটা বেশ প্রত্যন্ত, নেটওয়ার্ক পৌঁছায়নি এখনও।'

'এজন্যই তাহলে আমার কথা মনে পড়ল,' কপট রাগের ভঙ্গি করল পেইন্টার। 'বিকল্প হিসেবে!'

'না,' কুশল বিনিময় শেষ হতে এবার কাজের কথা তুলল সাফিয়া। 'তোমার সাহায্য চাই।'

'অবশ্যই পাবে,' সোজা হয়ে বসল পেইন্টার। 'কী হয়েছে বলো।'

'সুদানের উত্তরাংশে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটা উদ্ধার প্রকল্পের ব্যাপারে হয়তো শুনেছ।'

অন্যমনস্কভাবে গাল চুলকাল পেইন্টার। কোথায় যেন শুনেছে খবরটা। 'সম্ভবত সম্প্রতি কোন একটা ঝামেলা হয়েছিল ওখানে, তাই না?'

মাথা নেড়ে সায় দিল সাফিয়া। 'মরুভূমিতে আমাদের একটা সার্ভে টিম হারিয়ে গিয়েছে।'

এবার মনে পড়েছে সিগমা ডিরেক্টরের। খবরটা সম্পর্কে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট কানে এসেছিল। 'যতদূর মনে পড়ছে, দলটা বিদ্রোহীদের হাতে পড়েছিল বলেই সবার ধারণা।'

ভ্রূকুটি করল সাফিয়া। 'হুম, আমরাও সেরকম ভেবেছিলাম। কিন্তু দশ দিন আগে, দলটার প্রধান, প্রফেসর হ্যারল্ড ম্যাককেব-হঠাত করেই মরুভূমিতে আবির্ভূত হন। আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন ভদ্রলোক, অনেকটা বন্ধুর মতোই বলা যায়। তবে হাসপাতালে আনার আগেই মারা যান তিনি। প্রায় এক সপ্তাহ পর আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করে কর্তৃপক্ষ। দু'দিন আগে লাশটা নিয়ে আমি মিশর থেকে ফিরেছি।'

'তার মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করছি।'

মাথা নিচু করে ফেলল সাফিয়া। 'ভেবেছিলাম ওখানে গেলে হয়তো নিখোঁজ সার্ভে টিমের বাকি সদস্যদের কোন হদিস পাব। দলের সাথে প্রফেসরের ছেলেও ছিল।'

'পেয়েছ কিছু?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটা। 'না। উল্টো ঘটনা আরও জট পাকিয়েছে। হ্যারল্ডের লাশটা অদ্ভুত এক অবস্থায় পাই আমরা। সাথে থাকা মিউজিয়ামের এক সহকর্মীর মতে-আত্ম-মমিকরণ নামক কোন একটা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসর, যাতে মৃত্যুর পরও লাশটা অবিকৃত থাকে।'

ভ্রূ কুঁচকে মনিটরের দিকে তাকাল পেইন্টার। মাথায় ভিড় জমিয়েছে একগাদা প্রশ্ন, কিন্তু সাফিয়াকে নিজে থেকেই সব বলতে দেয়া উচিত এখন।

'কোষীয় নমুনা সংগ্রহ-সহ আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি আমরা। চেষ্টা করছি এ কাজে ব্যবহৃত লতা-গুল্মের পরিচয় বের করতে। এতে হয়তো ঘটনাটা কোন এলাকায় ঘটছিল, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।'

বুদ্ধিমতী মেয়ে . . . মনে মনে ভাবল পেইন্টার।

'তবে ময়নাতদন্তের সময় প্রফেসরের মস্তিষ্ক এবং প্রধান স্নায়ুতন্ত্রে আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে।'

'কী?'

'নিজেই বরং দেখে নাও,' বলে কম্পিউটারের কীবোর্ডে হাত রাখল সাফিয়া। 'একটা ভিডিয়ো পাঠাচ্ছি। ফুটেজটা কায়রোর মর্গ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।'

ডাউনলোড হওয়ার সাথে সাথে ভিডিয়োটা চালু করল পেইন্টার। অডিও নেই, তবে দৃশ্যগুলো মোটামুটি পরিষ্কার। একটা স্টিলের টেবিল দেখা যাচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক-করোনার সম্ভবত, বাকিদের সরিয়ে দিয়ে ক্যামেরাম্যানকে কাছে আসার ইশারা করল। টেবিলে শুয়ে আছে প্রফেসরের লাশ, খুলির কাটা অংশ দিয়ে মগজ উঁকি মারছে। ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য।

থমকে গেল পেইন্টার। 'আমি কি ঠিক দেখলাম? মনে হলো, খুলির ভেতরের অংশগুলো যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে!'

'হ্যাঁ,' সায় দিল সাফিয়া। 'ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছি আমি। অবশ্য সময়ের সাথে সাথে কমে এসেছে জ্বলজ্বলে ভাব, আগে নাকি আরও উজ্জ্বল ছিল।'

ভিডিয়ো দেখা শেষ হলে ঘাড় সোজা করল পেইন্টার। 'এসবের কারণ ধরতে পেরেছ?'

'না। নমুনার পরীক্ষা এখনও চলছে। আমাদের ধারণা-স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, কোন ধরনের জৈবিক অথবা রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এসেছিলেন হ্যারল্ড। জিনিসটা যা-ই হোক না কেন, পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপের দিকে এগোচ্ছে।'

'কেন?'

'দুটো কারণে। প্রথমত, আজ সকালে করোনার ড. বাডাউইকে ফোন করেছিলাম আমি। কয়েকটা রিপোর্ট আমাদের কাছে পাঠাতে ভুলে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তখনই জানতে পারি, তিনি এবং তার ময়না-তদন্তকারী দলের বাকি সদস্যরা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন . . . উচ্চমাত্রার জ্বর, বমি আর পেশীর খিঁচুনি।'

মনে মনে মাঝখানের সময়টুকু হিসাব করে নিল পেইন্টার। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা . . .'

'খুলি কাটার আট ঘণ্টার মধ্যেই প্রথম উপসর্গ হিসেবে জ্বর দেখা দেয়। এখন তাদের বাড়ির লোকজনও একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আক্রান্তদের আলাদা করে রাখতে বলেছি, কিন্তু ইতিমধ্যে কয়জন আক্রান্ত হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদের কাছে সঠিক কোন তথ্য নেই।'

কায়রোর জনসংখ্যার ব্যাপারে পেইন্টারের বেশ ভালো ধারণা আছে। ওরকম ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এরকম একটা রোগ . . . সামলানো মুশকিল হবে।

সাথে সাথে একটা কথা খেলে গেল সিগমা ডিরেক্টরের মাথায়। 'সাফিয়া, তুমি এখন কেমন বোধ করছ?'

'ভালো। ময়নাতদন্তের সময় ল্যাবে ছিলাম না আমি। লাশের ওই অদ্ভুত অবস্থা দেখার পরপরই সবকিছু সিল করে ফেলার আদেশ দেই।'

'আর লন্ডনে পৌঁছানোর পর?'

একটু বিমর্ষ দেখাল সাফিয়ার চেহারা। 'সতর্ক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। তবে হিথ্রো বিমানবন্দরের কাস্টমস জানিয়েছে: নড়া-চড়ার সময় লাশ বহনকারী বাক্সটার ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু কায়রোতে না লন্ডনে, তা সঠিক জানা যায়নি।'

পেইন্টারের পেটে যেন দলা পাকিয়ে উঠল। হিথ্রো আর কায়রো, দুটোই পৃথিবীর ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোর কাতারে পড়ে। দূষণ বাইরে ছড়িয়ে পড়লে বড় ধরনের বিপদ হবে।

সাফিয়াও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছে। 'এখানকার ল্যাবে লাশটা নিয়ে সর্বপ্রথম কাজ করা দুই টেকনিশিয়ানও প্রাথমিক উপসর্গ দেখাচ্ছে। ওই দুই টেকনিশিয়ানকে তো বটেই, ওরা যাদের সাথে পরবর্তীতে দেখা করেছে, তাদেরকেও কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়েছি। দুই বিমানবন্দরেই কাজে লাগানো হয়েছে গণস্বাস্থ্য এজেন্সিকে, তারা নিশ্চিত করবে মালামাল বহনের সাথে সম্পৃক্ত কেউ হঠাত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করছে কি না। তবে রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের কারণে ভয় হচ্ছে, আদৌ কী আমাকে কিছু জানানো হবে!'

'দেখছি কী করা যায়,' ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে পেইন্টারের মগজ। কিছুদিন আগেই রোগ-জীবাণু ছড়ানোতে বিমানবন্দরের ভূমিকা শীর্ষক এম.আই.টির একটা রিপোর্ট পড়েছে সে। দু'হাজার নয় সালে, সোয়াইন ফ্লু-তে পৃথিবীব্যাপী তিন লক্ষ মানুষ মারা যায়। তার সূত্রপাতও এভাবেই হয়েছিল।

জড়িয়ে আসছে সাফিয়ার গলা। 'আ . . . আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

তাকে শান্ত করার প্রয়াস পেল পেইন্টার। 'তোমার তো কোন দোষ নেই। যতটুকু সম্ভব, তুমি করেছ। লাশটা সিল করার বুদ্ধিটা না দিলে অবস্থা আরও খারাপ হত।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'তবুও . . . খারাপ লাগছে। কিন্তু এই দূষণ ছড়িয়ে পড়তে দেখার পর আন্দাজ করতে পারছি, কেন নিজের শরীরকে মমি করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন হ্যারল্ড।'

'কেন?' জানতে চাইল সিগমা ডিরেক্টর। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে, সাফিয়ার অনুমানগুলো বেশিরভাগ নির্ভুল হয়।

'সম্ভবত নিজের মাথা ভেতর যা আছে, সেটাকে আটকে রাখার জন্য। মমি হয়ে গেলে অবিকৃত থাকবে তার মৃতদেহ। আর এই অদ্ভুত জিনিসটাও সংরক্ষিত থাকবে মমির মাথার ভেতর।'

আরেকটা কথা মনে পড়ল পেইন্টারের। 'পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পেছনে তুমি দুটো কারণের কথা বলেছিলে . . . অন্যটা কী?'

সরাসরি স্ক্রিনের দিকে তাকাল সাফিয়া। 'আমার মনে হয়, ব্যাপারটা আগেও ঘটেছে।'

বিকেল ৫:০২ বি.এস.টি.
লন্ডন, ইংল্যান্ড

কথাটা হজম করার জন্য পেইন্টারকে এক মুহূর্ত সময় দিল সাফিয়া, তারপর আবার শুরু করল। 'হ্যারল্ডের ফিরে আসার খবর পাওয়ার পর, তার সব ধরনের রেকর্ড নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করি আমি . . . এমনকি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হাতে লেখা কিছু জার্নালও। ভেবেছিলাম, তার ওভাবে নিখোঁজ হওয়া আর হঠাত ফিরে আসার একটা কারণ আন্দাজ করতে পারব।'

'কিছু বুঝতে পেরেছ?'

'সম্ভবত . . . '

'কী?'

'প্রথমত তোমাকে বুঝতে হবে, সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেয়ে ভিন্ন ছিলেন হ্যারল্ড। প্রতিষ্ঠিত মতবাদগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পছন্দ করতেন তিনি, বিশেষ করে মিশর-সংক্রান্ত ব্যাপারে। এরকম উদ্ভট আচার-ব্যবহারের জন্য যেমন প্রশংসিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন ঘৃণিতও। নিজের ব্যাপারে অন্যদের আলোচনা-সমালোচনা শুনতেন ঠিকই, কিন্তু ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিতেন না কাউকে।'

পুরনো স্মৃতি মনে করতে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল সাফিয়ার মুখে। হ্যারল্ডের মতো আর কাউকে দেখেনি কখনও সে। মতের মিল না হওয়া সত্ত্বেও বাবার পিছু পিছু সব জায়গায় যেত তার ছেলে রোরি। প্রায়ই চোখে পড়ত, ক্রমাগত তর্ক করছে পিতা-পুত্র। তবে কথা কাটাকাটি হলেও ছেলের জন্য গর্ব ফুটে থাকত হ্যারল্ডের চোখে।

বাস্তবতা মনে পড়তেই ঠোঁট থেকে মুছে গেল হাসি।

দু'জনই হারিয়ে গিয়েছে . . .

নিজেকে সামলাল সাফিয়া। শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে এখন। হ্যারল্ডের ছেলে যদি এখনও বেঁচে থাকে, তাহলে তাকে উদ্ধার করা তারই দায়িত্ব। দীর্ঘ দু'বছর আশা করে আছে জেন, বাবা আর ভাই এখনও জীবিত। তার জন্য হলেও অন্তত সত্যিটা খুঁজে বের করা উচিত।

পেইন্টারের গলা শুনে সাফিয়ার সম্বিত ফিরল। 'অতীতের সাথে প্রফেসর হ্যারল্ডের কী সম্পর্ক?'

প্রসঙ্গে ফিরে এল সে। 'মিশর-সংক্রান্ত ব্যাপারে তার ব্যাপক আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে এক্সুডাসের প্রাচীন কাহিনি সম্পর্কে। এমনকি এসব নিয়ে সহকর্মীদের সাথেও আলোচনা করতেন তিনি।'

'এক্সুডাস? মিশর থেকে ইহুদিদের নিয়ে মোজেসের সেই মহা-প্রস্থান?'

নড করল সাফিয়া। 'অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, কাহিনিটা নিছক একটা ঐতিহাসিক গল্পের চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

'আর প্রফেসর?'

'তিনি একমত ছিলেন না। তার ধারণা, সব সত্যি। যুগের পর যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে চলে আসা গল্পটা হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল।' বলে টেবিলে স্তূপ করে রাখা হ্যারল্ডের ফিল্ড জার্নাল, সহকর্মীদের বর্ণনা ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করল সাফিয়া। 'আমার মনে হয়, নিজের মতবাদের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্যই সুদান অভিযানে বেরিয়েছিলেন প্রফেসর।'

'ওখানে কেন?'

'উনি যে হ্যারল্ড . . .সবার চেয়ে আলাদা! অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সিনাই পেনিনসুলার দিকে যায়, তিনি কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন দক্ষিণ দিক। তার ধারণা ছিল, নীল নদের তীর ধরে ইহুদিদের ছোট কোন দল ওদিকে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

'আচ্ছা, ঠিক করে বলো-কী খুঁজছিলেন তিনি?'

'প্লেগের কোন চিহ্ন, বিশেষ করে নীলের পার্শ্ববর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পাওয়া মমিগুলোর ভেতর। প্রাচীন রোগ-বিশারদ ড. ডেরেক র‍্যাঙ্কিনকে মূলত এজন্যই নিয়োগ দেন হ্যারল্ড।'

চেয়ারে হেলান দিল পেইন্টার। 'আর এখন, দু'বছর পর তিনি নিজেই মরুভূমিতে উদয় হলেন অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হয়ে। শুধু তাই না, সাথে আবার আত্ম-মমিকরণ নামক কী একটাও নাকি জুটেছে। এসবের মানে কী?'

মাথা নাড়ল সাফিয়া। 'জানি না।'

'কিন্তু তুমি তো বললে, এসব দূষণ-ফূষণ নাকি আগেও ঘটেছে। তুমি কি তাহলে প্রাচীন মিশরের সেই প্লেগের কথা বলছ?'

'না,' হ্যারল্ডের একটা জার্নাল হাতে তুলে নিল সাফিয়া। বের করল আগেই চিহ্নিত করে রাখা একটা অংশ। 'অভিযানে বেরোনোর আগে, ওই এলাকার রোগ-জীবাণু সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন প্রফেসর। তখনই এখানকার আর্কাইভে প্রখ্যাত অভিযাত্রী স্ট্যানলি আর লিভিংস্টোনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু একটা খুঁজে পান তিনি। তারা দু'জনই নীল নদের উৎস খোঁজার জন্য চষে বেড়িয়েছেন সুদানের গভীরে।'

'যতদূর মনে পরে . . .' মাথা চুলকাল পেইন্টার। 'জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিলেন লিভিংস্টোন, পরে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।'

'নিখোঁজ হওয়ার ছয় বছর পর, স্ট্যানলি তাকে ট্যাঙ্গানিকা লেকের পাড়ে অবস্থিত একটা আফ্রিকান গ্রাম থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেন।'

'কিন্তু এসবের সাথে প্রফেসর ম্যাককেবের অভিযানের সম্পর্ক কোথায়?'

'এই দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন হ্যারল্ড। আফ্রিকা অভিযান না, বরং তাদের পরবর্তী কাজের ব্যাপারে।'

'কেন? কী এমন করেছেন তারা?'

'১৮৭৩ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত আফ্রিকাতেই ছিলেন লিভিংস্টোন। হ্যারল্ডের আকর্ষণের মূল কারণ-ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার আগে তার মৃতদেহটাকে মমি করে ফেলে স্থানীয়রা।'

'তার দেহটাকে মমি করে ফেলা হয়েছিল?'

মাথা নেড়ে সায় দিল সাফিয়া। 'তারপর লাশটা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়।'

'আর স্ট্যানলি?'

'তিনি ব্রিটেনেই ফিরে আসেন। এক ওয়েলস মহিলাকে বিয়ে করার পর যোগ দেন পার্লামেন্টে। তার জীবনধারার প্রেক্ষিতেই ভদ্রলোকের প্রতি আকৃষ্ট হন হ্যারল্ড।'

'কেন?'

'তোমাকে বুঝতে হবে . . . স্ট্যানলির নাম, যশ সবই লিভিংস্টোনের সাথে জড়িত। আফ্রিকায় মারা যাওয়ার পর, স্ট্যানলিকে তার উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত করা হয়। তাই লিভিংস্টোনের অভিযানে উদ্ধারকৃত তালিসমানের বেশিরভাগ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের করায়ত্ত হলেও, কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রয়ে যায় স্ট্যানলির এস্টেটে। উনিশ শতকে এস্টেটটা লুপ্ত হওয়ার পর অবশেষে ঘুরে-ফিরে

সবকিছুর ঠাঁই হয় মিউজিয়ামেই। ওখানকার একটা তালিসমান হ্যারল্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'

'কী ছিল ওটা?'

'একটা তালিসমান . . . বাচ্চার প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ লিভিংস্টোনকে এক আদিবাসী উপহার দেয় জিনিসটা, গায়ে খোদাই করা মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ। আর আদিবাসীদের মতে, নীল নদের জলরাশি রক্তে পরিণত হওয়ার সময়কার পানি ভরা আছে ওটার ভেতর।'

'রক্তে পরিণত হওয়া মানে?' অবাক হলো পেইন্টার। 'মোজেসের আমলের কথা বলছ?'

সাফিয়া জানে, সিগমা ডিরেক্টরের এই প্রতিক্রিয়ায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রথমবার শোনার পর, তার নিজের অবস্থাও সেরকমই হয়েছিল। 'অনেক রকম ব্যাখ্যাই দাঁড় করানো যেতে পারে। লিভিংস্টোন ছিলেন স্বনামধন্য খ্রিষ্টান মিশনারি। হতে পারে, তাকে খুশি করার জন্য তালিসমানের সাথে ঐতিহাসিক ঘটনাটা জুড়ে দেয় আদিবাসীরা। তবে হায়ারোগ্লিফের স্বকীয়তার কারণে হ্যারল্ড মনে করতেন, আসলেই জিনিসটার সাথে প্রাচীন মিশরের সম্পৃক্ততা আছে।'

'তবে বর্তমান ঘটনার সাথে ওই তালিসমানের কী সম্পর্ক?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সাফিয়া। 'লিভিংস্টোনের ব্যক্তিগত কাগজপত্র ঘেঁটে হ্যারল্ড জানতে পারেন, জিনিসটা অভিশপ্ত।'

'অভিশপ্ত?'

'হ্যাঁ। মিউজিয়ামের অধিকারে আসার পর তালিসমানটা খুলে দেখা হয়। কয়েকদিনের মাঝে অদ্ভুত রোগে ভুগে মারা যায় প্রজেক্টে কাজ করা কর্মচারীদের সবাই। প্রফেসর তার জার্নালে জ্বর-সংক্রান্ত উপসর্গের কথা লিখে গিয়েছেন।'

'কায়রোতে ধরা পড়া রোগটার মতোই মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল পেইন্টার। তারপর কী হলো?'

'এতটুকুই জানি,' জবাব দিল সাফিয়া। 'বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন প্রফেসর। কিন্তু বাইশজন মানুষের মৃত্যুর পরও তেমন বিশেষ কিছু নির্ণয় করা যায়নি।'

'ব্যাপারটা সন্দেহজনক। মনে হয়, কেউ সব তথ্য-প্রমাণ মুছে ফেলেছে।'

'হ্যারল্ডের তাই ধারণা। কর্তৃপক্ষও একই কথা ভেবেছিল। ব্যাপারটার সাথে স্ট্যানলির সম্পৃক্ততা সন্দেহ করে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রয়্যাল সোসাইটির সামনে আনা হয় তাকে।'

'কেন?'

'কারণ মৃত্যুর আগপর্যন্ত তার সাথে লিভিংস্টোনের যোগাযোগ ছিল।'

ভ্রূকুটি করল পেইন্টার। 'লিভিংস্টোনের লাশটাকেও তো মমি করা হয় তারপর?'

সাফিয়াও পাল্টা ভ্রূ কুঁচকাল। 'হুম, হয়তো তার মৃত্যুর সাথেও কোন রহস্য জড়িয়ে আছে।'

'মানে?'

'হ্যারল্ডের মতো একই ঘটনা লিভিংস্টোনের সাথেও ঘটে থাকতে পারে। হতে পারে, তার ওই মমিকরণ প্রক্রিয়াও মৃত্যুর আগেই শুরু হয়েছিল।' বলে শ্রাগ করল সাফিয়া। 'রেকর্ডে শুধু লেখা, মমি করা অবস্থায় ইংল্যান্ডে পৌঁছায় লিভিংস্টোনের মৃতদেহ। তাই হয়তো সবাই ধরে নেয়, মৃত্যুর পরই কাজটা করা হয়েছে।'

'ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। তবে ধরে নিলাম, তোমার ধারণা সত্যি। তাহলে ?'

'আশা করি এর ফলে হ্যারল্ড আর সার্ভে টিমের বাকিরা কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, তা জানতে পারব। সম্ভবত কিছু একটা আবিষ্কার করেছিলেন প্রফেসর, সেটাই তাদের ওই পথে পরিচালিত করে।'

'দূষণ বেড়ে গেলে কিন্তু জায়গাটা খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তাও বাড়বে,' সরাসরি সাফিয়ার চোখের দিকে তাকাল পেইন্টার। 'সাহায্যের জন্য আমি কী করতে পারি, বলো।'

'যতটুকু তোমার পক্ষে করা সম্ভব,' মেয়েটার চোখে ফুটে উঠেছে ভীত দৃষ্টি। 'কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, ঝামেলার পাহাড়ের সবেমাত্র চূড়াটা নজরে এসেছে।'

সায় দিল পেইন্টার। 'হয়তো তোমার কথাই সত্যি।'

'হাতে সময় কম। হ্যারল্ডের ফিরে আসার প্রায় দুই সপ্তাহ হতে চলল।'

হ্যাঁ-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পেইন্টার। 'তার মানে, আস্তে আস্তে মুছে আসছে প্রফেসরের মরুভূমির ট্রেইল।'

'জেন, হ্যারল্ডের মেয়েও আমার সাথে আছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়ার আশায় বাবার ব্যক্তিগত কাগজপত্র ঘাঁটছে সে। কাজে নেমেছে গণস্বাস্থ্য কর্মচারীরা, রোগটার কারণ খতিয়ে দেখছে।'

'তোমাকে সাহায্য করার জন্য লন্ডনে একটা দল পাঠাচ্ছি আমি,' পেইন্টার বলল। 'সুদানের ব্যাপারটাও দেখতে হবে, কোত্থেকে এভাবে উদয় হলেন প্রফেসর ম্যাককেব . . .'

সাফিয়া বুঝতে পারল, সিগমা ডিরেক্টরের মাথার কলকব্জা কাজ করতে শুরু করেছে। আবার কিছু বলার আগেই অফিসের দরজা খোলার আওয়াজ হলো।

চেয়ার ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল সাফিয়া। জুনিয়র এক কিউরেটর এসেছে, নাম ক্যারল ওয়েন্টজেল। 'কী হয়েছে তো . . .?'

কথা শেষ করার আগেই মেয়েটাকে ধাক্কা মেরে দৃশ্যপটে হাজির হলো এক অচেনা আগন্তুক। হাতের উদ্যত অস্ত্র সরাসরি তার বুকের দিকে তাক করা।

চমকে উঠল সাফিয়া। তবে দেরি হয়ে গিয়েছে।

পরপর দু'বার গর্জে উঠল অস্ত্র। বুকে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়েছে, খাবি খেতে খেতে টেবিলে ঝুঁকে পড়ল সাফিয়া। হাত উঁচু করছে মনিটরে ফুটে থাকা পেইন্টারের ছবির উদ্দেশ্যে, সাহায্য চাইছে যেন।

আবারও গুলির আওয়াজ। এবারের লক্ষ্য কম্পিউটার মনিটর। কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে, কাঁচে মাকড়শার জাল এঁকেছে বুলেট। সাথে সাথে কালো হয়ে গিয়েছে স্ক্রিন।

কালো হয়ে আসছে সাফিয়ার পৃথিবীটাও . . .

তিন

৩০ মে, রাত ৬:৩৪ বি.এস.টি.
অ্যাশওয়েল, হার্টফোর্ডশায়ার, ইংল্যান্ড

নিজ পরিবারের কুটিরে, নিজেকেই অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে জেন ম্যাককেবের। চিলেকোঠার ভুতগুলো যেন পেয়ে বসেছে ওকে। ছোট, দমবন্ধ করা জায়গাটার যেদিকেই তাকাচ্ছে না কেন, অনুপস্থিত সদস্যদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে মেয়েটার। ওই যে, কোনায় থাকা ঘুণ ধরা ওয়ারড্রোবে এখনও রয়েছে ওর মায়ের কাপড়। এক পাশে জড়ো করা রাখা ওর ভাই, রোরির পুরাতন সব খেলার সরঞ্জাম: ধুলো পড়া ক্রিকেট বল, হাওয়া অর্ধেক বেরিয়ে যাওয়া ফুটবল, এমনকী হাইস্কুলে পড়ার সময় কেনা রাগবি জার্সিটাও আছে।

তবে এসবের চাইতেও ওকে বেশি জ্বালাচ্ছে আরেকটা ছায়া। যে ছায়ার মালিক বেঁচে থাকা অবস্থায় কখনও তার নিচ থেকে বেরোতে পারেনি ওরা। সেই মালিক এখন মৃত, কিন্তু তবুও মাথার উপরে ঝুলছে সেই ছায়া। পুরো জায়গাটা জুড়ে ভেসে রয়েছে ওর বাবার ব্যক্তিত্ব! চিলেকোঠা ভর্তি অগণিত বাক্স। কিছু কিছু তো ভদ্রলোকের সেই বিশ্ববিদ্যালয় দিনের! অনেক বই এবং ফিল্ড জার্নালও আছে।

ড. আল-মায়াজের অনুরোধে, এরইমধ্যে বেশ কিছু বাক্স খুঁজে দেখেছে ও। বিশেষ করে যেগুলো সবচেয়ে কম নোংরা, সেগুলো। ওগুলোর ভেতরেই আছে মরুভূমিতে ওর বাবার হারিয়ে যাওয়ার দুই-তিন বছর আগের সব লেখা। বাক্স নামিয়ে ডেরেক র‍্যাঙ্কিনের হাতে তুলে দিয়েছিল জেন। ছেলেটা রান্নাঘরে ওগুলো নিয়ে যাবার পর, একসাথে সবগুলো বাক্স ঘেঁটে দেখেছে ওরা। যদি রোরি বা তার বাবার কোন হদীস মেলে!

কোন লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না, কিন্তু একা একা বসে থাকার চাইতে তো ভালো! বলা যায়, পিতার মৃত্যু এবং তার দেহের এই অবস্থাকে মেনে নেয়ার একটা প্রয়াস ছিল এই কাজটুকু।

পিছু ফিরে লাভ নেই, এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

আড়মোড়া ভাঙল জেন, তাকিয়ে রইল ছোট চিলেকোঠাটার জানালা দিয়ে বাইরে। ওই যে, অদূরেই দেখা যাচ্ছে অ্যাশওয়েল গ্রামটাকে। মধ্যযুগীয় কুটির আর কাঠ-প্লাস্টারের ছাদ নির্মিত দালানের এক অদ্ভুত মিশ্রণে তৈরি জায়গাটা। এত উপর থেকে গ্রামের চার্চটার টাওয়ার দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ওটার ইতিহাস সেই চোদ্দো শতাব্দীর। বাতাসে ভেসে আসা সুর শুনতে পেল সে। প্রতি বছর অ্যাশওয়েলে

একটা গানের অনুষ্ঠান বসে, গত দশ দিন ধরে চলছে এ বছরেরটা। আজকেই শেষ রাত।

প্রাচীন টাওয়ারটার দিকে মন দিল জেন। একে-বেঁকে উঠে গিয়েছে ওটার সিঁড়ি; একদম উপরে রয়েছে তীক্ষ্ণ চূড়া, যেন আকাশের দিকে ইঙ্গিত করছে। নয় বছর বয়স যখন ছিল ওর, তখন বাবা একবার ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেয়ালে আঁকা মধ্যযুগীয় গ্রাফিতিগুলো দেখিয়েছিলেন পরম আগ্রহে। ওটার নিচে ল্যাটিন ও ইংরেজিতে লেখা ছিল সেই তেরো শতাব্দীর ভয়ঙ্কর ব্ল্যাক মহামারী-এর কথা।

ছোট বেলায়, কয়লা দিয়ে এরকম অনেক ছবি সে নিজেও এঁকেছে। কাজটা করার সময় মনে হতো, বহু শতাব্দী আগে মৃত্যু বরণ করা চিত্রকরের সাথে কোন এক বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছে সে। হয়তো এরকম মুহূর্তগুলোই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য উৎসাহ জাগিয়েছে ওকে, প্রত্নবিদ্যাকে বেছে নিয়েছে পেশা হিসেবে।

জানালা থেকে অন্যদিকে নজর সরাল জেন। চার্চে দেখা একটা চিত্রের নকল নজরে পড়ে গেল ওর। এই চিত্রটার সাথে অবশ্য ব্ল্যাক প্লেগের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য এই মুহূর্তটার সাথে পুরোপুরি মানিয়ে যায়।

'সুপারবিয়া প্রেসিডিট ফ্যালাম,' ল্যাটিন শব্দগুলো উচ্চারণ করল ও।

অহংকার-ই পতনের মূল।

বাবাকে ভালবাসে জেন, তাই বলে ভদ্রলোকের চারিত্রিক দুর্বলতাগুলো তার নজর এড়ায়নি। বড় একগুঁয়ে ছিলেন তিনি, নিজ বিশ্বাসের ব্যাপারে গোঁড়া। অহংকার বলতে গেলে ছিল তার মজ্জাগত। জেন জানে, শুধু জ্ঞানার্জন নয়, এই অহংকারও বাবার মরুভূমিতে অভিযান চালাবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। বাইবেলে বর্ণিত এক্সুডাসের সত্যতা প্রমাণের ব্যাপারে তার যে অদম্য আগ্রহ আছে, সেজন্য সহকর্মীদের কাছে অনেক কথা শুনতে হয়েছে তাকে। দুনিয়ার সামনে নিজেকে শক্ত হিসেবে উপস্থাপন করতেন তিনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের তত্ত্বকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন-শুধু মাত্র ইতিহাসের খাতিরেই নয়, নিজের আহত অহংবোধকে চাঙ্গা করার জন্যও।

দেখ, বাবা, তোমার এই অহংকার কী পরিণতি বয়ে এনেছে . . .শুধু তোমার না, রোরির-ও!

মুহূর্তের জন্য দুঃখকে হারিয়ে ওকে দখল করে নিল রাগ। কিন্তু আরও একটা অনুভূতি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে ওর ভেতরে-অপরাধবোধ। পারিবারিক কুটিরে ফিরে না আসার একটা কারণ এই অনুভূতি। বলতে গেলে পরিত্যক্তই থাকে জায়গাটা, আসবাবগুলো ঢাকা থাকে কাপড়ে। লন্ডন থেকে অ্যাশওয়েলে আসতে

ট্রেনে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না, তবুও একটা স্টুডিও-অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে নিয়েছে শহরে। নিজেকে বুঝিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কাছে হয় বলেই করেছে কাজটা। কিন্তু নিজের মনকে কি আর ভুল বোঝানো যায়? এখানে ফেরার কথা ভাবলেই কষ্টে ভরে উঠে বুকটা। খুব বড় ধরনের প্রয়োজন না হলে তাই আসে না। এই যেমন এখন, ড. আল-মায়াজের অনুরোধে এসেছে।

রান্নাঘর থেকে চিৎকার ভেসে এল একটা, 'কিছু একটা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে!'

অতীতের স্মৃতির হাত থেকে ছাড়া পাবার আনন্দে, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল জেন। পার্লারটা পার হয়ে ছোট রান্নাঘরে প্রবেশ করবে, এমন সময় আবিষ্কার করল-ডেরেক সবগুলো পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার চিলেকোঠায় অনেকক্ষণ কাটাবার পর আলোতে এসে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে ওর। পিট-পিট করে চোখ পরিষ্কার করে নিল সে।

ডেরেক বসে রয়েছে রান্নাঘরের টেবিলে। কনুইয়ের কাছে জড়ো হয়ে আছে বই আর জার্নালের একটা স্তূপ, আর টেবিল জুড়ে ছড়িয়ে আছে ইতস্তত কাগজ। জ্যাকেট খুলে রেখেছে ছেলেটা, হাত গোটানো। জেনের চাইতে ছয় বছর বড় যুবক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়-ই ওকে নিজের ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছিলেন বাবা। অনেকের মতো এই ছেলেটাও তার বাবার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড আকর্ষণ এড়াতে পারেনি। মাঝে মাঝেই ডেরেক আসত এই কুটিরে, কখনও কখনও রাতও কাটাত।

তখন অবশ্য এই অযাচিত আগন্তুকের আগমনকে ভালো চোখেই দেখত জেন। বিশেষ করে যখন থেকে ওর মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন থেকে। ডেরেকের সাথে কথা বলা সবসময়ই সহজ মনে হতো। জেনের কথা শোনার মতো যখন অন্য কেউ ছিল না, তখনও ছেলেটা মন দিয়ে শুনত। তবে রোরি ব্যাপারটাকে ওর মতো সহজে নিতে পারেনি। ওর মনে হতো, এই যুবক এসেছে ওর পিতার মনোযোগ কেড়ে নিতে। সম্ভবত সেই সাথে তার অর্জনেও ভাগ বসাতে!

এই মুহূর্তে চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা আর্কাইভের উপর ঝুঁকে আছে ডেরেক। চামড়ার ভাঁজ দেখে বোঝা যাচ্ছে, এই জিনিস প্রফেসর ম্যাককেবের লেখা হতেই পারে না। প্রফেসরের চাইতেও অনেক বেশি বয়স তার। ছেলেটার চেহারার উপর নজর পড়ল জেনের, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। মিশর থেকে ফেরার পর, দু'জনের কেউ খুব একটা ঘুমাতে পারেনি।

'কিছু খুঁজে পেলে?' জানতে চাইল সে।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ডেরেক, বড়-সড় আর্কাইভটা তুলে ধরে বলল, 'আমার ধারণা, এই জিনিসটা তোমার বাবা গ্লাসগোর কোন লাইব্রেরী থেকে চুরি করেছিলেন!'

'গ্লাসগো?' ভ্রু কুঁচকে তাকাল জেন। ওর মনে পড়েছে, সুদানে যাবার আগে বেশ কয়েকবার স্কটল্যান্ড ঘুরে এসেছিলেন বাবা।

'দেখো,' আহ্বান জানাল ডেরেক।

একটুকরা কাগজ ব্যবহার করে আর্কাইভের নির্দিষ্ট একটা জায়গা চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল ও। সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়া মাত্র ছেলেটার দেহের গন্ধ নাকে এসে লাগল জেনের। সুগন্ধি ব্যবহার করেছে ডেরেক, অথবা তার শ্যাম্পুর গন্ধও হতে পারে। ওর নাক থেকে চিলেকোঠার সোঁদা বাতাস সরাতে সাহায্য করল গন্ধটা।

'ট্যাগ দেখে যা বুঝলাম,' বলল ডেরেক। 'বইটা এসেছে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভিংস্টোন আর্কাইভস থেকে। বিশিষ্ট এই অভিযাত্রীর অধিকাংশ লেখা সেখানেই রয়েছে। এই বিশেষ আর্কাইভটায় রয়েছে তার লেখা নানা চিঠি ও বর্ণনা। জাম্বেজি নদীতে তার প্রথম অভিযান থেকে শুরু করে নীল নদের উৎস খোঁজার দিন পর্যন্ত! তোমার বাবা যে জায়গাটা দাগ দিয়ে রেখেছে, সেখানে লিভিংস্টোনের সাথে হেনরি মর্টন স্ট্যানলির চিঠি আছে। আফ্রিকার গহীন অঞ্চল থেকে ভদ্রলোককে এই স্ট্যানলিই উদ্ধার করে এনেছিলেন।'

কৌতূহলী জেন ডেরেকের পাশে এসে দাঁড়াল। 'কী লেখা আছে চিঠিতে? বাবা এত আগ্রহী হলেন কেন?'

শ্রাগ করল ডেরেক। 'অধিকাংশই অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে-যেন দুই বন্ধু কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করছে। তবে এই দাগ দেয়া পাতাগুলো দেখো, ওগুলোতে লিভিংস্টোনের হাতে আঁকা কিছু ছবি আছে। এই পাতাটা বিশেষভাবে দাগ দিয়ে রেখেছেন তোমার বাবা। আমার নজর কেড়েছে এই ছোট পোকাটার নাম। দেখ।'

কাগজের দিকে মন দিল জেন।

Ateuchus sacer

লিভিংস্টোন যে দক্ষতার সাথে ছবিগুলো এঁকেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। একটা ছবিতে পাখা ছড়ানো, একটায় ছড়ানো না। ওটার বৈজ্ঞানিক নাম উচ্চঃস্বরে পড়ল জেন, '*Ateuchus sacer*. বুঝলাম না। এই গুবরে পোকা গুরুত্বপূর্ণ কেন?'

'কেননা এই নাম দিয়েছেন খোদ চার্লস ডারউইন।' ভ্রু কুঁচকে মেয়েটার দিকে তাকাল ডেরেক। 'একে আদর করে তিনি ডাকতেন-'মিশরীয়দের পবিত্র পোকা' বলে।'

আচমকা বুঝতে পারল জেন, 'ওহ।'

'আজকাল একে ডাকা হয় *Scarabaeus sacer* বলে।' জানাল ডেরেক।

বাবার আগ্রহের কারণ কিছুটা বুঝতে পারছে জেন। প্রাচীন মিশরীয়রা এই পবিত্র গুবরে পোকার পূজা করত। কারণ একটাই-বিষ্ঠাকে ছোট ছোট বলে পরিণত করার অদ্ভুত এক ক্ষমতা ছিল এদের। তাদের বিশ্বাস, এই কাজটার সাথে দেবতা খেপরি-সকাল বেলায় যিনি নাম ধারণ করেন রা-তার কাজের মিল পাওয়া যায়। তিনিও আকাশে বলের মতো করে ঠেলে নিয়ে যেতেন সূর্য গোলককে। মিশরীয় সাহিত্য ও চিত্রশিল্পের সব জায়গায় গুবরে পোকার কোন না কোন উল্লেখ পাওয়া যায়।

পুরাতন বইটার আরও কাছে চলে এল জেন। 'লিভিংস্টোনকে দেয়া তালিসমানটা নিয়ে বাবা গবেষণা করতেন, তাই তার ডায়েরীতে থাকা মিশরের সব উল্লেখ নিয়ে মাথা ঘামাবেন-এতে আর আশ্চর্য কী?' চেয়ারে ফিরে গেল সে। 'কিন্তু গ্লাসগো থেকে বই চুরি করবেন কেন? এমন বিশ্বাসঘাতকতা তো তার করার কথা না!'

'আমি জানি না। আরও কয়েকটা পাতায় দাগ দেয়া আছে। মনে হচ্ছে, যে সব স্কেচে কোন ধরনের অক্ষরও আছে, সেগুলোর দিকে বেশি নজর ছিল তার।' বইটা বন্ধ করে জার্নালের দিকে হাত বাড়াল ডেরেক। 'অদ্ভুত ব্যাপারটা হচ্ছে, সুদানে যাবার আগের কয়েকটা মাস তিনি তালিসমান নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন! অথচ আমাকে একবারের জন্যও বলেননি! শুধু বলেছিলেন, সুদানের অভিযান থেকে পাওয়া মমিগুলোর মাঝে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল কিনা তা দেখতে।'

'তেমন কিছু পেয়েছিলে?'

'নাহ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেরেক। 'মনে হয়েছিল, তোমার বাবার ভরসার প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হয়েছি!'

ছেলেটার কনুই স্পর্শ করল জেন। 'দোষ তোমার না। বাবা সবসময় চাইতেন . . .নাহ, ভুল বললাম। এক্সুডাসের তত্ত্বটা যে সত্য-তা দেখাবার জন্য তার কোন না কোন প্রমাণ দরকার ছিল।'

তবুও অসন্তুষ্টির ভাবটা গেল না ডেরেকের চেহারা থেকে। আবার জার্নালটা খুলল সে। 'তালিসমানটার ব্যাপারে অনেক কিছু লিখে রেখেছিলেন তিনি। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সব ধ্বংস করে দিয়েছে। যাই হোক, জিনিসটার কয়লা দিয়ে আঁকা একটা প্রতিকৃতি রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। সেই সাথে ওটার ভেতরে হায়ারোগ্লিফে লেখা শব্দগুলোরও। এই জার্নালে আছে সব।'

পাতাটা দেখাল ডেরেক, পিতার হাতের লেখা পরিষ্কার চিনতে পারল জেন। তালিসমানটার কয়লা দিয়ে আঁকা প্রতিকৃতির একটা ফটোকপিও আছে ওখানে।

'আরিয়াবোলস, মানে তেল রাখার পাত্র বলে মনে হচ্ছে।' জেন মন্তব্য করল। 'দুই মাথা দেখা যাচ্ছে। একপাশে সিংহের মুখ, অন্য পাশে এক মিশরীয় মহিলার। অদ্ভুত!'

'হাতে লেখা বর্ণনা অনুযায়ী, পাত্রটা বানানো হয়েছিল মিশরীয় পদ্ধতিতে, নীলকান্তমণির মতো নীল রঙা কাচের প্রলেপ ছিল সাথে।'

'হুম . . .তেমনটাই হবার কথা . . .বিশেষ করে যেসব পাত্র বানানোই হয় পানি ধরার জন্য, সেসব এভাবেই বানানো হয়।' মিশরীয় পদ্ধতিতে বানানো মৃৎপাত্রে কাঁদা, সিলিকা আর কোয়ার্টজের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। শুকিয়ে যাবার পর জিনিসটার সাথে মাটির চাইতে কাচের মিল পাওয়া যায় বেশি। 'আকার কেমন ছিল?'

'এখানকার লেখা অনুসারে, ছয় ইঞ্চি মতো লম্বা। ভেতরে তরল ধরে প্রায় এক পাইন্ট। জাদুঘরের ওরা পাথরের মুখবন্ধটাকে খুলে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। ওটা আবার জায়গামতো লাগান ছিল শক্ত, রেসিনের মতো মোম দিয়ে।'

'ফলশ্রুতিতে ওই আরিয়াবোলস পরিণত হয়েছিল পানি-অভেদ্যতে।'

মাথা ঝাঁকাল ডেরেক। 'পাতার নিচে লেখা জিনিসটা দেখ। তোমার বাবা ভেতরে আঁকা হায়ারোগ্লিফটা তুলে দিয়েছেন।'

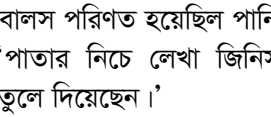

বই দেখার দরকার পড়ল না, দেখার সাথে সাথেই চিনতে পারল জেন, 'ইটেরু।'

'হুম . . .নদী।'

'নীল নদকেও এই নামেই ডাকত তারা।' কপাল ঘষল মেয়েটা। 'তালিসমানটা তাহলে লিভিংস্টোনকে যে স্থানীয়রা দিয়েছিল, তাদের কথা সত্যি!'

'হুম, ভেতরের পানিটা নীল নদ থেকেই এসেছে।'

'শুধু তাই না, তখন সেটা রক্তে পরিণত হয়েছিল।' জেন মনে করিয়ে দিল কথাটা। 'মোজেসের সেই দশ মহামারীর প্রথমটা।'

'ভালো কথা, এটা দেখ।' বলে একটা পাতা ওল্টালো ডেরেক। জেনের বাবা ওখানে দশটা মহামারীর তালিকা করেছেন।

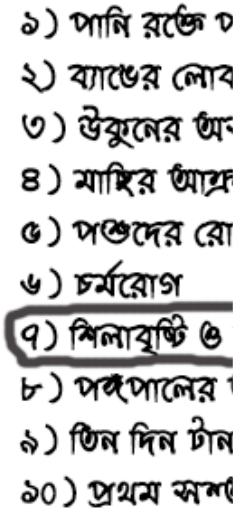

তালিকাটা সাজানো হয়েছে ঘটনাক্রম হিসেবে। কিন্তু কেন যেন সাত নাম্বার মহামারীটাকে দাগ দিয়ে রেখেছেন ওর বাবাঃ শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত।

মেয়েটার ভ্রু কুঁচকানি নজর এড়াল না ডেরেকের। 'কিছু বুঝলে?'

'নাহ।'

আচমকা বেজে উঠল কুটিরের ফোন, চমকে উঠল দু'জনেই।

বিরক্ত দেখাল জেনকে। ওর ধারণা, ড. আল-মায়াজ ফোন করেছেন। উত্তরের জন্য চাপ দিতে চাইছেন ওদেরকে। কিন্তু উত্তর বলা যায়-এমন কিছুই বের করতে পারেনি, উল্টো উন্মোচিত হয়েছে নতুন আরও রহস্য। এগিয়ে গিয়ে পুরনো দিনের ফোনটা তুলে ধরল ও। হ্যালো বলতে যাবে, তার আগেই ত্রস্ত একটা কণ্ঠ জানতে চাইল, 'জেন ম্যাককেব?'

'হ্যাঁ। কে বলছেন?'

'আমার নাম পেইন্টার ক্রো।' দ্রুত বলে চলছে কণ্ঠটা, আমেরিকান টান স্পষ্ট। 'আমি সাফিয়া আল-মায়াজের বন্ধু। এক ঘন্টার কিছু আগে, জাদুঘরে ওর উপরে হামলা হয়েছে?'

'মানে? কীভাবে?' তথ্যটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে জেনের।

'বেশ কয়েকজন মারা গিয়েছে। যদি তোমার বাবার সাথে সম্পর্কজনিত কোন কারণে আক্রমণটা ঘটে থাকে, তাহলে এরপর তোমার উপরেই হবে হামলা। জলদি নিরাপদ কোথাও চলে যাও।'

'কিন্তু-'

'যা বলছি শোনো, থানা খুঁজে বের করে সেখানে আশ্রয় নাও।'

কাছে-ধারে ওরকম জায়গা বলতে হয় লেচওয়ার্থ, আর নয়তো রয়স্টোন। কিন্তু জেনের সাথে গাড়ি নেই। ট্রেনে চড়ে এসেছে ওরা দুইজন।

'তাহলে লোকজন আছে, এমন কোথাও যাও।' ফোন দাতা সাবধান করে দিল কথাটা শুনে। 'মানুষ-জনের মধ্যে থাকো। আমি সাহায্য পাঠাচ্ছি।'

ততক্ষণে কিছু একটা আঁচ করতে পেরে উঠে দাঁড়িয়েছে ডেরেক। 'কোন সমস্যা?'

বিস্ফারিত চোখে যুবকের দিকে তাকিয়ে রইল যেন, মনের ভেতর চিন্তার ঝড় খেলা করছে। 'আমি . . .একটা পাব আছে, কাছেই। নাম দ্য বুশেল অ্যান্ড স্ট্রাইক।' ঘড়ির দিকে নজর গেল ওর। সাতটা বেজেছে অনেক আগেই, এতক্ষণে পাবটা লোকে গিজগিজ করার কথা।

'সেখানেই যাও! এখুনি!' কেটে গেল ফোন।

লম্বা একটা শ্বাস নিল জেন, ভয় দূরে রাখার চেষ্টা করছে।

ফোন কর্তার কথা যদি ঠিক হয় তো . . .

টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'ডেরেক, জার্নালটা নিয়ে নাও। গ্লাসগোর ওই আর্কাইভটাও। আর কোনটা যদি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়ে, সেটাও নাও।'

'কী ব্যাপার?'

ডেরেককে সাহায্য করতে করতেই উত্তর দিল জেন, 'আমরা মহাবিপদে পড়ে গিয়েছি!'

রাত ৭:১৭

জেনের জন্য দরজা ধরে রেখেছিল ডেরেক। কী হচ্ছে, তা কিছু বুঝতে পারছে না যুবক। সবকিছুই অবাস্তব মনে হচ্ছে।

জেন পোর্চ পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ছেলেটা। আগাছা-বহুল সামনের বাগান দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা, সেই সাথে নিচু দেয়ালের ওপাশটাও। সূর্য এখনও ডোবেনি, তবে ডুবু-ডুবু করছে। ছায়া এসে পড়েছে রাস্তায়।

'কী হয়েছে?' আবারও জানতে চাইল যুবক। 'কে হামলা করবে তোমার ওপর?'

ভয় পাবার মতো কিছু নজরে পড়ল না জেনের, তাই ইস্পাতের ছোট দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। 'আমি জানি না, হয়তো কেউ-ই না! সম্ভবত ড. আল-মায়াজকে যারা আক্রমণ করেছে, তারাই!'

জেনের পিছু নিল ডেরেক, এক সাথে দুইজনে পা রাখল রাস্তায়। বন্ধু আর সহকর্মীদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে জেনকে নিরাপদে রাখার প্রতিজ্ঞাটাও হয়েছে আরও দৃঢ়।

'ওই ফোন দাতার কথা বিশ্বাস করা যায়?' জানতে চাইল সে।

ওর দিকে তাকাল জেন, প্রশ্নটা ওকেও নাড়া দিয়েছে। 'আমার . . .আমার তো তা-ই মনে হয়। কেউ আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইলে কী আর জন-সম্মুখে থাকতে বলত?'

তা তো বটেই . . .

'আর তাছাড়া,' বলল জেন। 'দুই-গ্লাস গলায় ঢালতে পারলে ভালোই লাগবে। স্নায়ুকে শান্ত করতে হবে তো!' মুচকি হাসল সে, হাসি ফিরিয়ে দিল ডেরেকও।

'ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করবে যখন,' বলল সে। 'প্রথমটা নাহয় আমিই কিনে দেব। হাজার হলেও, আমি একজন ডাক্তার।'

চোখে দুষ্টামি নিয়ে মন্তব্য করল জেন, 'হুম, কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের!'

'উহু, জৈব-প্রত্নতত্ত্বের।' ঠিক করে দিল ডেরেক। 'খাঁটি ডাক্তারের মতোই।'

চোখ উল্টে ইশারা করল যেন, 'তাহলে চলুন, ডাক্তার সাহেব, এগোনো যাক।'

অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার পরে, স্থানীয় পাবের পেছনের গলিতে চলে এল ওরা। দ্য বুশেল অ্যান্ড স্ট্রাইক পাবটা মিল স্ট্রিটের উল্টোদিকেই। সেন্ট মেরি'স চার্চ ও তার চারপাশের বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে পাবটা।

কাছাকাছি চলে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, গোধূলি এরইমাঝে নেমে এসেছে পাবের পেছনের প্যাটিওতে। টেবিলগুলো প্রায় ভর্তি, পেছনের খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে ভেতরের গুঞ্জন।

পরিচিত লয় এবং হাসির আওয়াজ ডেরেকের সব ভয় ধামা-চাপা দিয়ে দিল। অচেনা ভয়কে আর খুব একটা আতঙ্ককর বলে মনে হচ্ছে না। দ্য বুশেল অ্যান্ড স্ট্রাইকে প্রায়ই আসত সে, জেনের বাবার সঙ্গী হয়ে। কখনও কখনও সারা রাত কাটিয়ে কুটিরে ফিরত পরদিন ভোরে।

মনে হচ্ছে, যেন ঘরে ফিরে এসেছে।

এক মহিলার গানও শুনতে পাচ্ছে সে। রাস্তা পার হয়ে প্রতিধ্বনি এতদূরেও আসছে। মনে পড়ে গেল ওর-আজকে অ্যাশওয়েল অনুষ্ঠানের শেষ দিন।

পাবটা যে খদ্দেরে ভর্তি হয়ে আছে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

পরিস্থিতির বিচারে, ব্যাপারটা ওদের জন্য যে ভালো তাতে কোন সন্দেহ নেই!

হাসি-ঠাট্টার আওয়াজ শুনে, সে যেন চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। কোন ধরনের আক্রমণ ছাড়াই, নিরাপদে পাবটার পেছনের দরজায় এসে উপস্থিত হলো ওরা। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল, দু'জনে সামনে দুটো পানীয় নিয়ে বসে আছে। কয়েকজন স্থানীয় খদ্দের জেনকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে সান্ত্বনা জানাল। প্রফেসর ম্যাককেবের উধাও হয়ে যাওয়া, আবার কয়েক বছর ফিরে আসার ঘটনাটা খবরের কাগজে বড় বড় করে ছাপা হয়েছে।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল জেন, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে ওর কাঁধ, মানুষের এই আচমকা আগ্রহ ওর ঠিক হজম হচ্ছে না। প্রতি মুহূর্তে কী হারিয়েছে-সে কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। অভদ্রের মতো আচরণ করল না বটে, কিন্তু মুখে ধরে রইল কাষ্ঠ একটা হাসি। এক পর্যায়ে ডেরেক অন্যদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল। মানুষ-জনের সদয়, কিন্তু অস্বস্তিকর মনোযোগের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াল যুবক।

সেই সাথে এক চোখ রেখেছে সামনের দরজার দিকে। যে-ই ঢুকুক না কেন, ক্লান্ত চোখে দেখছে তাকে। অনুষ্ঠানের জন্য স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ আসছে পাবে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর যুবকের সন্দেহ হতে লাগল-ফোন দাতা ভুল করেনি তো আবার! কেননা, শত্রুর কোন চিহ্নই ধরা পড়ছে না ওর চোখে।

আচমকা সামনের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে প্রবেশ করল কেউ একজন, অস্থির দেখাচ্ছে।

'আগুন!' বাইরের দিকে ইঙ্গিত করে চিৎকার করতে শুরু করল আগন্তুক।

এক মুহূর্ত পর দেখা গেল, খদ্দেররা সবাই পাবের বাইরে অবস্থান নিয়েছে। তারাও আগন্তুকের মতো একইভাবে চিৎকার করছে!

জেন আর ডেরেকও পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে। জনস্রোতে আলাদা হয়ে গেল দু'জন।

'জেন!' চিৎকার করে ডাকল সে।

রাত নেমেছে ততক্ষণে, হঠাত করে কমে গিয়েছে তাপমাত্রাও। অন্ধকার রাস্তার ঠিক মধ্যখানে হোঁচট খেল বেচারা। এদিকে কিছুটা দূরেই দেখা যাচ্ছে আগুনের উজ্জ্বল জিহ্বা, অন্ধকার ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে সেই আগুনের আভায়।

হায় . . .হায়!

অবশেষে জেনকে দেখতে পেল সে, ওর থেকে কয়েক গজ সামনেই আছে মেয়েটা। তবে পিঠ দিয়ে আছে এদিকে, কনুই দিয়ে ধাক্কা-গুঁতা মেরে জেনের কাছে পৌঁছে গেল ও। প্রফেসর ম্যাককেবের মেয়ের চেহারায় ভয়ের ছায়া পরিষ্কার। সম্ভবত সে-ও ওই ধোঁয়া আর আগুনের উৎপত্তি স্থল চিনতে পেরেছে।

'আ . . .আমাদের বাড়ি।' বিড়বিড় করে বলল সে।

শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরল ডেরেক।

'কেউ একজন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

চারপাশে নজর বুলালো ডেরেক, সন্দেহজনক কিছু যদি চোখে পড়ে! আগুনের আভায় চারপাশকে মনে হচ্ছে যেন নরকের কোন টুকরা। দূর থেকে ভেসে আসছে ফায়ার সার্ভিসের অ্যালার্ম, পরিস্থিতিকে যেন আরও ঘন করে তুলেছে সেটা।

'এখান থেকে সরতে হবে,' জেনকে উদ্দেশ্য করে বলল ও।

কেউ যদি সত্যি সত্যি কুটিরে আগুন ধরিয়ে দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই প্রফেসরের সব গবেষণাপত্র জ্বালিয়ে দেবার জন্যই দিয়েছে। আচমকা কাঁধে ঝোলানো জার্নাল আর আর্কাইভ ভর্তি ব্যাগটাকে আরও বেশি ওজনদার বলে মনে হচ্ছে। ভেতরের কাগজগুলোর গুরুত্ব হঠাত করেই বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। তবে সেটা নিয়ে বেশি চিন্তা করছে না ও। প্রতিপক্ষের আসল লক্ষ্য ঠিক বুঝতে পারছে যুবক।

প্রফেসর ম্যাককেবের মেয়ে!

জেনকে ঘুরিয়ে দিল ডেরেক, আগুনের দিক থেকে সরিয়ে নিল তার দৃষ্টি। 'আমাদের-'

আচমকা কেউ একজন আঁকড়ে ধরল যুবকের কাঁধ, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। অবাক ডেরেক পিছিয়ে গেল কয়েক পা। জেনের সামনে ঝুঁকে আছে বিশাল বড় এক অবয়ব। দেখে মনে হয়, কোন ছোট্ট বাচ্চার দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে এসেছে লোকটা।

তাই বলে তো আর ডেরেক পিছিয়ে আসতে পারে না। আক্রমণকারীকে উদ্দেশ্য করে লাফ দিল ও-জান দিয়ে হলেও রক্ষা করবে জেনকে।

বিশালদেহী লোকটার হাতের এক আলতো ঝাপটাই যথেষ্ট। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল বেচারা। আছড়ে পড়ল রাস্তায়। ঝাপসা চোখে দেখল, জেনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিশালদেহী।

না . . .